প্রাঙ্গণ

ম্পাদকের সাফাই

শাদ্বল - অর্থ 'কচি ঘাসে ঢাকা জমি'। 'কচি' শব্দটাকে 'অতিকাঁচা' বা 'অপরিণত' অর্থে ব্যবহার করতে চাইছি না। বরং 'কচি' একটি রং ; বড়ই দৃষ্টিনন্দন। এই রঙেই এর স্পর্শকাতর ব্যঞ্জনা। আমাদের প্রাত্যহিক ক্লান্তি-বিষাদের মাঝখানে যদি কোনো 'সবুজ ঘাসের দেশ' সত্যি পেয়ে যাই 'দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর', তবে আহা ! তবে আমাদের নান্দনিক স্নান ; চোখে দৃষ্টিনন্দন 'সবুজের সমারোহ'; অর্থ জানি নাকো ; বুঝি নাকো ; ভালো লাগে — এই যথেষ্ট। এক খন্ড কচি ঘাসে ঢাকা ভূমি—কোনো দায় নিয়ে জন্মায় কি কখনও ? অথচ, সৃষ্টির কি আশ্চর্য উৎকর্ষ ! আমার 'শ্বাদল' এই হোক ; যদি ভালো লাগে — এই যথেষ্ট ; এর অতিরিক্ত কিছু যদি এতে পাই, তবে তা হোক উপরি পাওনা।

তাহলে এই ভূমিকার অভিপ্রায় কি ? বুঝতে বাকি নেই বোধহয়। শিল্পকে, এই অর্থে সাহিত্যকে, মূলতঃ নান্দনিক রূপেই দেখতে চায় এই পত্রিকা। সামাজিক দায়বদ্ধতার দিব্যি এখানে নেই ; সাহিত্য সবসময় আমার দায় উদ্ধারের অস্ত্র নয়। আবার বিশুদ্ধ শিল্প নয় বলে অনিবার্যভাবে সাহিত্য নান্দনিকতার অতিরিক্ত কোনো না কোনো স্বাদ - ভাবনা - বোধ দ্বারা সম্পৃক্ত হয়। এই স্বাদ - ভাবনা - বোধ বিশেষ সামাজিক দায়ের সাথে সম্পর্কিত হলেও ক্ষতি নেই ; আবার হয়নি বলে আপত্তিও নেই। শুধু কানে ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনে সাহিত্যকে সামাজিক দায় পালনে বাধ্য করার মতো স্বেচ্ছাচারিতায় সায় দেয় না মন। কেননা, এতে এর বহুমুখী বিকাশ বিঘ্নিত হয়। সাহিত্য মুক্ত; আবার, সব মুক্তি বা স্বাধীনতাই আপেক্ষিক ; তাই সীমাবদ্ধ। আপাততঃ এই সীমাবদ্ধতার লাগামটি থাক নান্দনিকতার হাতেই ন্যস্ত।

যা হোক, এই প্রথম সংখ্যাটি গল্প, কবিতার পাশাপাশি জোর দিয়েছে প্রবন্ধ সাহিত্যের উপরেও। দুটো প্রবন্ধে বিশেষভাবে ধরবার চেষ্টা হয়েছে এ-যাবৎ অল্প-আলোচিতকবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চিন্তা-ভাবনা ও কাব্যসাধনার বিভিন্ন দিক। সেই সাথে প্রকাশিত হল সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদারকে লেখা কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠি। এই চিঠিটির অন্যতম প্রধান গুরুত্ব হল এই যে এতে রয়েছে 'ভাই অমিয়'কে কবির লেখা একটি কবিতা। আর বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হস্তাক্ষরের সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত নই ; তাই, চিঠিটি মূল হস্তাক্ষরেই মুদ্রণ করা হল।

এখন, ২৫ বৈশাখ পত্রিকার প্রকাশ। কবিগুরু থাকবেন না — এ হয় না। তাই, কবিগুরুর চিত্রকলার কিছু দিকের কথা রয়েছে আর একটি প্রবন্ধে। পাঠকের ভালো লাগলে বুঝব, প্রয়াস ছোট হলেও সার্থক হয়েছে।

❑ সম্পাদক

শাদ্বল

বাৎসরিক সাহিত্যের কাগজ

প্রথম বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা

প্রকাশ

২৫শে বৈশাখ , ১৪০৯

৯মে , ২০০২

প্রচ্ছদ ও প্রচ্ছদলিপি

অনিরুদ্ধ পালিত

অলঙ্করণ / ভাবচিত্র অঙ্কন

অনিরুদ্ধ পালিত

সম্পাদক

নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

লেজার প্রিন্টিং

সঞ্জয় বসু , আর. আর. এন. রোড ,

কোচবিহার।

মুদ্রণ

এস. বি. অফসেট প্রিন্টিং

আর. আর. এন রোড , কোচবিহার।

সাহায্য মূল্য ঃ ১০ টাকা

ঃ সূচী ঃ

সম্পাদকের সাফাই

সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদারকে লেখা কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠি

ছোটগল্প ঃ

ছোটমাসি — সৌগত , আর বিনতা / সৌমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। পৃঃ ৪

কবিতা ঃ

জল / অমর চক্রবর্ত্তী। পৃঃ ১১

দুঃসময়ের জার্নাল / উত্তম দত্ত পৃঃ ১২

স্বপ্ন ও গল্পের কথা/ সমীর চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ১২

অগ্নিহোত্রী,যদি তুমি / শুভাশিস চৌধুরী পৃঃ ১৩

আমি যে মেয়ে /সন্তোষ সিংহ পৃঃ ১৩

মেঘালয়ের পথে/ নিত্য মালাকার পৃঃ ১৪

বা তারপরেও কিছু / রামকান্ত রায় পৃঃ ১৪

প্রবন্ধ ঃ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা / অম্লানজ্যোতি মজুমদার। পৃঃ ১৫

জীবনানন্দ ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ মিল-অমিলের সন্ধানে/ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য। পৃঃ ১৮

রবীন্দ্র-চিত্রকলার টেক্‌নিক্ ও বিষয়বস্তু / ডঃ সুবোধ সেন পৃঃ ২৯

নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক শিবযজ্ঞ রোড, খাগড়াবাড়ী, কোচবিহার থেকে প্রকাশিত।

ফোন নং - সম্পাদক , শাদ্বল - ২২১৩৫

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি অপ্রকাশিত চিঠি

Phone : PK 1544

GANAVARTA

37, Ripon St., Calcutta-16

আর এক আরম্ভের [illegible]
(অমিয় - কে)

কাজ নেই তার মনে নেই কাতরতা
তাই সে নীরবে পার করে অবসাদকে;
তারপর ঘুম, সারারাত্রির দাবি
যদিও হৃদয় [illegible] হাঁকে: [illegible] !

কাজ নেই তবু [illegible]
বর্ষশেষে কি [illegible];
কোথাও দাঁড়াতে সাধ নেই, নেই শান্তি;
[illegible] ঘুম [illegible] !!

বর্ষশেষ, ১৩৬১ ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভাই অমিয়,
মন অসুস্থ। তোমার বই-এর আলোচনা এখনো লিখে উঠতে পারিনি; তবে [illegible] নিশ্চয়ই। [illegible] লিখেছি বীরেন্দ্র চক্রবর্তী।
ভালোবাসা নাও। বীরেন ॥
২/১/৬২

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চিঠিটি লিখেছিলেন ‘ভাই অমিয়’কে , অর্থাৎ, সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদারকে। এই দুই সাহিত্য-সাধকের আন্তরিক সম্পর্কের স্মৃতি হয়ে আছে এই চিঠিটি। ঐ সময়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘গণবার্তা’ পত্রিকায় কাজ করতেন ও পত্রিকার ছাপানো পোষ্টকার্ডেই এই চিঠিটি লিখেছেন। স্মৃতি ও ইতিহাস বহনের পাশাপাশি চিঠিটি বহন করছে কবির লেখা একটি অপ্রকাশিত কবিতা। সযত্নে রক্ষিত এই চিঠিটি প্রকাশের জন্য আমার হাতে তুলে দেন সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদারের পুত্র শ্রী অম্লান জ্যোতি মজুমদার মহাশয়। তার এই সহযোগিতার জন্য ‘শাদ্বল’ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

" ছোটমাসী - সৌগত , আর বিনতা "

— সৌম্যেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

' সান্‌স্ এন্ড লাভার্স '- এর মতো এ কোন ফ্রয়েডিয়ান মনোস্তত্ত্বের ভারবাহী আখ্যান নয়; কেননা এখানে চরিত্রের চিত্তবৃত্তিতে কোনো সাইকো-প্রবলেম নেই; বরং আছে নির্ভরতা , সহানুভূতি,ভালোলাগার শ্রেয় দাম্পত্য পরিণতি , প্রথায় অবাঞ্ছনীয় হলেও তা উদার মূল্যায়ণের দাবী রাখে। -সম্পাদক

(১)

দরজা খুলতেই চোখ পড়লো সৌগতর । একটি মেয়ে,পঁচিশ ছাব্বিশের মত বয়স । মিষ্টি চেহারা । কিন্তু চোখে মুখে একটা বিপর্যয়ের ছাপ। চেনা চেনা মনে হচ্ছে । কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিল না।

— এটাই কি সৌগত গুহের বাড়ী ?

— হ্যাঁ , আমিই সৌগত। আপনি ?

— আমি বিনতা । তোমার ছোটমাসী।

ছোটমাসী। মার কাছে কত শুনেছে ছোটমাসীর কথা । মায়েদের বড় আদরের বোন। চেহারা যেমন মিষ্টি, স্বভাবও তেমন মিষ্টি। পাশাপাশি দারুণ প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা। বাড়ীর লোকের সাথে ট্রেনে যাচ্ছিল । ট্রেনের মধ্যেই এক অভিজাত পরিবারের চোখে পড়ে গেল। ছেলের পক্ষের একান্ত আগ্রহে ঐ ছেলের সাথেই বিয়ে হয়ে গেল ছোটমাসীর।

বিয়ের প্রথম বছরটা ভালোই কেটেছে ছোটমাসীর। বছর পার হতে না হতেই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রয়াত হলেন শ্বশুর - শাশুড়ী। স্বামী অরূপ বিরাট চাকরী করে জব্বলপুরে । স্বামীর সাথে প্রাচুর্য আর সুখের মধ্যেই দিনগুলো কাটছিল তার । ছোটমাসী প্রথমে অতটা খেয়াল করেনি। কিন্তু কিছুদিন বাদেই স্বামীর আচরণে বেশ একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলো ছোটমাসী। বাড়ীর প্রতি অরূপের আকর্ষণটা ক্রমেই যেন কমে আসছিল। নানা কাজের অজুহাতে ইদানীং বাইরেই কাটায় বেশী সময়। মাঝে মাঝে অফিস থেকে ফোন করে জানিয়ে দেয় , " কাজ আছে , আজ আর বাড়ী যাওয়া হবে না। " কোন কোন দিন ফোনও করে না। বাড়ীও আসে না। উৎকণ্ঠা অশান্তিতে ছোটমাসী সারাটা রাত জেগে কাটায়। অফিসে ফোন করেও অরূপের কোন হদিশ পায় না । মাঝে মাঝে আবার নেশা করেও আসতে শুরু করলো। বিনতা প্রতিবাদ করে । শুরু হয় নতুন সংঘাত। মাঝে মাঝে তাকে মারতেও আসে পর্যন্ত। বিনতার পক্ষে এ জিনিস বেশীদিন মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। স্বামীর সাথে তর্ক - বিতর্ক , ঝগড়া-ঝাটি বেড়েই চলল ক্রমে। স্বামী শাসালো, পরিণতি খুব খারাপ হবে।

হ'লও তাই । স্বামী একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কেউ কিছু বলতে পারলো না। অফিসে খোঁজ নিয়ে জানলো , কোনো এক অজানা ঠিকানা থেকে ইস্তফাপত্র ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়েছে।

অথৈ জলে পড়লো বিনতা । বুঝে উঠতে পারছিলো না কি করবে। ক্ষোভে , দুঃখে , অপমানের জ্বালায় পাগল হওয়ার উপক্রম।

উপায়হীন হয়ে শেষপর্যন্ত আশ্রয়ের খোঁজে এসে হাজির হ'ল দিদির এই ছেলেটার কাছে। বোনপো সৌগত কয়েক বছরের বড় বিনতার চেয়ে, প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার; নিজের ভাইবোনদের মানুষ করতে গিয়ে সে আজ পর্যন্ত বিয়েও করতে পারেনি। ছোট দুই বোনের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। তারা কোলকাতার বাইরে থাকে। ছোটভাই সৌরভ তার কাছেই আছে। কলেজে পড়ে।

সেই ছোটমাসী ! সেই কত বছর আগে একবার দেখেছিল । কিছুই মনে নেই। তবে মার কাছ থেকে ওর সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছে।

— তা ছোটমাসী ! তুমি এখানে ? এতদিন বাদে , এভাবে ?

— তোমার এখানে আমায় থাকতে দেবে ? অনেক কষ্টে তোমার ঠিকানা জোগাড় করেছি।

— এভাবে বলছো কেন ? এস , আগে একটু বিশ্রাম কর। তারপর শুনব তোমার সব কথা।

ছোটমাসীর কাছ থেকে শুনল তার সব কথা। বললো , " কোনও চিন্তা কোরো না তুমি , তুমি আমার এখানেই থাকবে। আমি আর ভাই থাকি এতবড় বাড়ীটায়। তোমার কোনও অসুবিধা হবে না। "

কাজের মাসীকে ডেকে বলে দিল পাশের ঘরটা ঠিক করে দিতে। কয়েক দিনের মধ্যেই সমস্ত বাড়ীটার চেহারাটাই পাল্টে গেল। ছোটভাই সৌরভ দারুন খুশী। ছোটমাসী এত ভালো! কি মিষ্টি ব্যবহার! হাতের রান্না কি দারুন! কাজের মাসীর রান্না খেয়ে-খেয়ে খিদেটাই প্রায় মরে গিয়েছিল ছোটমাসীর আগমনে বাড়ীটায় যেন নতুন প্রাণের ছোঁয়া লাগল।

সেদিন দুপুরের পর থেকে তুমুল বৃষ্টি। সৌরভ কলেজে গেছে । সৌগত আজ অফিসে যায়নি । কি একটা পেপার রেডি করতে হবে; তাই বাড়ীতেই আছে; ঘরে বসে কি যেন লিখছে। বিনতা কখন এসে নিঃশব্দে বসে আছে খাটটার ওপর , সৌগত লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ কিসের প্রয়োজনে পেছনে তাকাতেই নজরে পড়লো।

— সে কি , ছোটমাসী ! কখন এসে বসে আছ ? আমাকে ডাকনি কেন ? বলবে কিছু ?

চুপ করে থাকে বিনতা।

— বল , কি বলবে ? কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি ?

— আমি থাকাতে বোধ হয় তোমার বিড়ম্বনা বাড়ছে।

— বিড়ম্বনা ! আমার ? শুনি , শুনি কি ধরনের বিড়ম্বনা ।

— ক'দিন থেকেই লক্ষ্য করছি , কাজের মাসী কেমন করে তাকাচ্ছে আমার দিকে। সেদিন পাশের বাড়ীর ভদ্রমহিলার সাথে মনে হয় আমাকে নিয়েই কথা বলছিল। আমাকে দেখেই থেমে গেল।

— তা বলতেই পারে। তাতে কি আসে যায় ? আমার দিক থেকে তো কোনও খারাপ ব্যবহার পাওনি ?

— সেটাই তো কারও কারও চোখে লাগছে। তুমি আমার প্রতি এত সদয় - এটা তো সবার ভালো নাও লাগতে পারে।

সদয় ! একথা বলছো কেন ! জানো মাসী , মার কাছে অনেকদিন আগে শুনেছি , তুমি ছিলে সবার খুব আদরের। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা , সেই তোমাকে এখন যখন দেখি তখন মনে হয় তুমি যেন এক বিষাদ-প্রতিমা। আমার যে কি কষ্ট হয় , তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। তোমার কষ্ট কিছুটা কমাতে পারলে আমার যে কি তৃপ্তি সেটা কে বুঝবে !

সৌগতর কথা শুনতে শুনতে ছোটমাসীর দু'চোখ বেয়ে নামে অশ্রুর ধারা। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে চলে যায়।

সে ধরনের জরুরী কাজ না থাকলে সৌগত এখন অফিস থেকে সোজা বাড়ীতেই চলে আসে। ইদানীং বাড়ি ফেরার অন্য ধরনের একটা তাগিদ বোধ করে। আগে অফিসের পর এদিক-ওদিক যেত। ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত। অফিস থেকে ফিরে জামা-কাপড় পাল্টে হাত-মুখ ধুয়ে নিজের

ঘরের সোফাটার ওপর বসে। কাগজগুলোর উপর চোখ বুলোয়। একটু বাদেই এক কাপ কফি নিয়ে ঘরে ঢোকে ছোটমাসী। কিছুক্ষণ বাদে নিয়ে আসে ডিশে করে নিজের হাতে তৈরী নানা ধরনের খাবার। হাতের গুণ অসাধারণ। একেক দিন একেক ধরনের খাবার।

খেতে খেতে বলে ওঠে সৌগত ঃ ''আমি ভাবছি লোকটার কথা। এ রকম একটা বৌকে ফেলে পালিয়ে যেতে পারে কেউ। লোকটা শুধু অমানুষই নয়। লোকটা একটা আস্ত আহম্মক।''

'' হয়েছে , অনেক হয়েছে! আর না।'' ছোটমাসী হাত দিয়ে মুখ চাপা দেয় সৌগতর।

সৌগতর চোখ পড়ল ওর সলাজ দুটি আয়ত চোখের ওপর। মুহূর্ত্তমধ্যে সৌগতর দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে গেল ওর ছোটমাসীর মুখ। ভেসে উঠলো এক চিরকালের নারীর মুখ।

সৌগত চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখে না ছোটমাসীর ভাগ্যলাঞ্ছিত জীবনটাকে একটু সহজ , একটু সুখী একটু আনন্দময় ক'রে তুলতে। তবুও যখনই তার চোখ পড়ে, তখনই সে দেখতে পায় কি এক গভীর শূণ্যতার আভাস ওর চোখে মুখে। কি এক বিষণ্ণতায় ভার তার সমস্ত সত্ত্বায়। মার কাছ থেকে শোনা সেই প্রাণোচ্ছ্বল মেয়েটি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তার জায়গায় এ যেন এক বিষাদ-প্রতিমা! একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভেতরটা কেমন হয়ে যায় সৌগতর। ভাবে, কি সুন্দর একটা মেয়ে। অথচ, এই অল্প বয়সেই সমস্ত আলোই যেন নিভে গেছে ওর জীবন থেকে।.

সেদিন অফিস থেকে ফিরে অন্যদিনের মতই হাতমুখ ধুয়ে সোফায় এসে বসলো খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে।

— দাদাবাবু , কফি !

— তুমি ! ছোটমাসী কোথায় ?

— ওনার প্রচন্ড জ্বর। বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না।

— সে কি ! কফির কাপটা হাতে নিয়েই সৌগত ছোটমাসীর ঘরে প্রায় ছুটেই যায়। দেখে বেহুঁসের মত বিছানায় পড়ে আছে ছোট মাসী। মাঝে মাঝে মুখ থেকে বের হচ্ছে এক অস্ফুট যন্ত্রণা ধ্বনি।

সৌগত গিয়ে ওর বিছানার পাশে বসলো। হাত দিল ওর কপালে। পুড়ে যাচ্ছে ওর কপালটা। আস্তে - আস্তে মুখটা নামিয়ে ডাকলো, ''ছোট মাসী! ছোটমাসী! খুব কষ্ট হচ্ছে!''

ধীরে-ধীরে চোখটা খুলে সৌগতর উদ্বিগ্ন মুখটার দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললো,'' না না কষ্ট হচ্ছেনা .... ।'' চোখের দুপাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো দু'ফোটা জল। বুজে এল চোখ দু'টো।

— আমি ডাক্তারবাবুকে ফোন করছি এক্ষুনি। এরাই বা কেমন? অফিসে আমাকে ফোন করে জানাতে পারলো না।

— ওদের কোনও দোষ নেই । আমিই ওদের কিছু জানাতে দেই নি। সন্ধ্যের সময় তোমার যখন ফিরে আসার সময় হ'ল তখনই আমি কাজের মাসীকে ডেকেছি।

অনেক কষ্টে কথাগুলো বলে অস্থির হয়ে পড়লো ছোটমাসী।

— থাক, থাক; তুমি আর কথা বোলো না । তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। এক্ষুনি ডাক্তার-বাবু এসে পড়বেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে ডাক্তার বাবু এসে পড়লেন। সব দেখে-শুনে বললেন,''খুব বাজে টাইপের ভাইরাল ফিভার। ঔষধ দিচ্ছি। আশা করি ,এতেই কাজ হবে। যদি না হয় ,কাল সকালে আমাকে জানাবেন।

হসপিটাল বা নার্সিংহোমে পাঠাতে পারলেই সব চেয়ে ভালো হোতো ; কারণ জ্বরটা সেরে গেলেও রোগী ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়বে। ভালো নার্সিং এর দরকার।''

সৌগত বললো , '' বাড়ীতেই থাক। নার্সিং এর কোন অসুবিধে হবে না। ''

ডাক্তারবাবু বললেন , ''সেটা হলে তো ভালোই। ''

সারারাত সৌগত জেগে থাকলো ছোটমাসীর পাশে। ডাক্তারের নির্দেশ মত ওষুধ খাওয়ালো ঘন্টা ধরে। ভোরের দিকেই জ্বরটা ছেড়ে গেল একেবারে। সৌগত আর পারছিল না। ঘরের কোণে চেয়ারটায় বসে মাথাটা হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো একসময়।

ডাক্তারবাবুর কথাই ঠিক। জ্বর সারলো ; কিন্তু, প্রচন্ড দুর্বল হয়ে পড়লো ছোটমাসী। উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারে না।

আশ্চর্য লাগলো ছোটভাই সৌরভের আচরণ। ছোটমাসীর ঘরমুখো পর্যন্ত সে হোলো না একবারের জন্যও। বেশী সময়টাই সে বাইরে-বাইরে কাটিয়ে দেয় ।

সৌগত একটানা অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুললো ছোটমাসীকে।

সেদিন ছোটমাসীর ঘরে একটা চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছিল সৌগত। ছোটমাসী শুয়েছিল নিজের বিছানায়। শুয়ে শুয়ে ভাবছিল ঃ সৌগত আমার কে ? এভাবে কেউ কারও জন্য করে ? বাইরে একটা পরিচয় আছে। ও আমার দিদির ছেলে। আমি ওর ছোটমাসী। এটাই কি সব ? আর ভাবতে পারে না । গভীর আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে ওর সমস্ত মন। দু'চোখ বেয়ে নামে অশ্রুর ধারা।

কাগজ থেকে মুখ তুলে ওর দিকে তাকাতে গিয়েই সৌগতর চোখে পড়লো ওর অশ্রুসিক্ত মুখখানি।

প্রায় ছুটে গেল ওর পাশে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ওর পাশে বসে জিজ্ঞেস করলো , '' কি হয়েছে তোমার ? কষ্ট হচ্ছে কোনও ? ''

'' না।'' মুখটা প্রায় লুকানোর মত করে অনেকটা অপ্রস্তুতের মত বলে উঠলো বিনতা,'' না কোন কষ্ট হচ্ছেনা । ''

— তা হ'লে কাঁদছো কেন?

''জানি না।'' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো যেন।

গভীর মমতায় সৌগত ওর চোখের জল মুছিয়ে দিল হাত দিয়ে।

ওর হাতের স্পর্শে থরথর করে কেঁপে উঠলো বিনতার শরীরটা। কিছুক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে বললো, '' একটা কথা বলবো।''

— বলো ,

— আমাকে তুমি কোথাও পাঠিয়ে দাও। আমি যে আর পারছিনা । কিছুতেই পারছিনা।

— কি পারছো না।

— না! না! এ পাপ; এ মহাপাপ। লক্ষ্মী টি , তুমি আমাকে পাঠিয়ে দাও অন্য কোথাও।

— মহাপাপ! কি বলছো তুমি! কেন বলছো একথা!

— না; না; এ হতে পারে না। আমি যে তোমার ছোটমাসী!

— সে তো সবাই জানে, তুমি যে আমার ছোটমাসী। আমি যে তোমার দিদির ছেলে, এ সহজ

সত্যটা তো সবাই জানে। কিন্তু এর চেয়েও যে বড় সত্য আছে!

— কি সে সত্য!

— তুমি যে আমার বিনতা।

— না, না, এ পাপ; মহাপাপ!

— না বিনতা, এ পাপ নয়। এ ভালোবাসা। তোমার মত একটা সুন্দর মেয়ের জীবন একটা হৃদয়হীন পাষন্ডের নিষ্ঠুরতার আঘাতে অকালে ঝোরে যাবে — এটা মেনে নেওয়াই কি পুণ্য; এক ভাগ্য বিড়ম্বিতা নারীর জীবনে গহন আঁধারে নবজীবনের প্রদীপ জ্বালানো কি পাপ; আর এ যদি পাপই হয়, তাহলেও আমার এ পাপের ভাগীদার হতে কোন আপত্তি নেই, তোমার আছে?

কিছুই বলতে পারলো না বিনতা, শুধু দু'চোখ বেয়ে নেমে এল নীরব অশ্রুধারা।

ছোটভাই সৌরভ সেদিন অনেক দেরী করে বাড়ী ফেরায় সৌগত তাকে একটু বকা-বকি করলো। বললো, "কিরে সৌরভ, লেখাপড়া নে? এভাবে আড্ডা দিয়ে ঘুরে বেড়ালেই চলবে?"

— বাড়িতেই আসতে ইচ্ছা করে না; তাই ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

— কেন?

— বাড়ির পরিবেশটাই পাল্টে গেছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাই। উপায় থাকলে এতদিনে চলেই যেতাম।

—কি বলতে চাস্ তুই?

— দাদা, তোমার আর ছোটমাসীর ঘনিষ্টতাটা খুব অশোভনভাবে বেড়ে যাচ্ছে। এটা পাপ! উনি তোমার মাসী— তুমি ওনার সাথে যে ভাবে মিশছো সেটা কিন্তু সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

চমকে উঠলো সৌগত। তবুও অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে বললো, "আচ্ছা সৌরভ তোর কষ্ট হয়না ছোট মাসীর জন্য"?

— হোতো এক সময়ে। এখন হয় না ।

— কেন? তুই তো বলতি,'ছোটমাসীটা এত ভালো। মেসোটা একটা জানোয়ার,' সেই ছোট মাসীর জন্য তোর কষ্ট হয় না? ভেতরটায় সহানুভূতি জাগে না!

— জাগতো । এখন জাগে না। ওকে এখন আমার ডাইনী মনে হয়। আর মনে হয় ডাইনীটা তোমার সর্বনাশ করছে।

— ছিঃ সৌরভ। কি বলছিস এসব!

— ঠিকই বলছি দাদা। এ পাপ; ভুলে যেও না ও আমাদের মাসী।

— জানি! তবে ওকি শুধু মাসীই? ও একটা মেয়ে না! ওর জীবনে কোনও আশা-আকাঙ্খা, সাধ-আহ্লাদ কিছুই থাকবে না? ঐ শয়তানটা যে ওর এই অল্প বয়সে সব কিছু শেষ করে দিল! তার জন্য ওকে একটু ভালোবাসা, ওর জন্য একটু বোধ— এ সব কিছুই পাপ! ও আমাদের ছোট মাসী, শুধু এজন্যই ওকে ভালোবাসা যাবে না। ওর মনটার কথা একবারও ভাববি না? ও তো একটা মেয়ে!

— না , না, না; তুমি ওকে তাড়িয়ে দাও এ'বাড়ি থেকে। এত বড় পাপের পথে তুমি আর এগিয়ো না দাদা।

— না; তা কোনভাবেই সম্ভব না। তোর যদি অসহ্য লাগে, তুই আমাকে বরং ত্যাগ কর। তবুও তুই আমাকে এত বড় অমানুষ হতে বলিস না।

চিৎকার করে উঠে সৌরভ, "তাই হবে। এ পাপের বাড়ী থেকে আমিও চলে যাচ্ছি।"

সত্যি সে চলে গেল।

ভাইটা চলে যাওয়ায় প্রায় ভেঙ্গে পড়লো সৌগত; বাবা মারা গেছেন কবে; মা'ও জীবিত নেই। দু'টো বোনেরও বিয়ে দিয়েছে বেশ কয়েক বছর হোলো। ওরা কোলকাতার বাইরে থাকে। ওরাও মনে হয় সৌরভের কাছ থেকে সব কিছু জেনে গেছে। ওরাও বোধ হয় দাদার এই পাপের কাহিনী জেনে এ বাড়ীমুখো আর হচ্ছে না। ছোটভাইকে সে কোনও দিন বাবা-মার অভাব বুঝতে দেয় নি। সেই ভাইটাও তাকে এভাবে ছেড়ে চলে যাওয়াতে সৌগত নিজেকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারছিল না। ভাঙা মন নিয়ে সব কিছু ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল তাও জানে না।

কার হাতের কোমল স্পর্শে ঘুমটা ভেঙে গেল।

— কে ?

— আমি ! তোমার ছোট মাসী। এভাবে অসময়ে ঘুমোচ্ছ কেন?

— ভালো লাগছিল না। ভাইটা এভাবে চলে গেল!

—সে জন্যই তো তোমায় বলেছিলাম, আমার জন্য তোমার বিড়ম্বনা বাড়ছে। শোন , আবার বলছি আমাকে তুমি কোথাও পাঠিয়ে দাও। তোমার তো কত জায়গায় কত জনের সাথে যোগাযোগ আছে; দাও না আমার একটা কাজের ব্যবস্থা করে। আমি চলে যাই। তুমিও বাচবে ডাইনীটার হাত থেকে।

— কি বললে?

—হ্যাঁ , আমি সব শুনেছি। সৌরভের সব কথা আমি শুনেছি। সত্যিই তো, আমি একটা ডাইনী। তোমার জীবনটাকে এভাবে শেষ করে দিচ্ছি। তুমি কত ভালো ছেলে। কত ভালো ঘর থেকে কত সুন্দরী, বিদুষী মেয়েদের কেউ আসবে তোমার বৌ হয়ে, আমার মত এক হতভাগিনীর জন্য তোমার এই সুন্দর জীবনটাকে কেন নষ্ট করবে।

বলতে বলতে চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল বিনতার মুখখানি।

নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলো না সৌগত। বিনতার অশ্রুস্নাত মুখখানি দু'হাত দিয়ে তুলে ধরে বলে উঠলো,"এ ভাবে বলছো কেন বিনতা? তাকাও, তাকাও। আমার দিকে দ'চোখ মেলে তাকিয়ে আবার বলো যা-যা বলছিলে।

সৌগতর বুকের মধ্যে মাথাটা রেখে কান্নায় ভে ঙে পড়লো বিনতা।

ওর পিঠটায় গভীর মমতায় হাত বুলোতে বুলোতে সৌগত বলে উঠলো, "তোমাকে আমি আমার কাছে রাখবো সারাটা জীবন"।

মাথাটা তুললো ছোটমাসী বললো, "কোন অধিকারে তুমি আমাকে রাখবে এমন করে?"

— ভালোবাসার অধিকারে, স্বামীর অধিকারে।

চমকে উঠলো বিনতা, "স্বামীর অধিকারে।"

— হ্যাঁ বিনতা। আমি তোমাকে স্ত্রীর মর্যদা দেবো।

শিউরে উঠলো বিনতা , "পাপ হবেনা,' আমি যে তোমার মাসী! তুমি যে আমার বোনপো!"

— আমি ওসব কিছুই বুঝি না। আমি শুধু বুঝি , তুমি একজন নারী; আমি একজন পুরুষ। আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি আমকে ভালোবাস। বলো বিনতা, বলো, এ মিথ্যে?

— সকলের অভিশাপে যে কালো হয়ে যাবে তোমার আমার জীবন।

— সেই কালোর মধ্যেই তো আমাদের ভালোবাসা আলো হয়ে জ্বলবে।

কেমন একটা ভয়ার্ত্ত চোখে সৌগতের দিকে তাকিয়ে থাকে বিনতা।

— তোমার ভয় করছে বিনতা?

—হ্যাঁ গো! আমার ভীষণ ভয় করছে।

— দ্যাখ তো, আমার এই অশান্ত বুকের মধ্যে তোমার মাথা রেখে তোমার ভয় কাটে কিনা!

বিনতার মুখটাকে পরম সোহাগে নিজের বুকের ভেতরে টেনে নেয় সৌগত।

জল / অমর চক্রবর্তী

হতাশা জল খাবেই

প্রশ্ন হ'ল — তা কি জল দেবো?

জনে জনে প্রশ্ন করা থাক।

একটি মেয়ে
তাঁর প্রেমিক বেদনা দিয়ে পালিয়েছে
সে বলল, আমার ফিল্টার চাই
বেশ ভদ্র ছিমছাম একটি ছেলে

নির্বাচনে হেরে যাওয়া নেতাটি বললেন
আমি গ্রাসরুট লেভেলের মানুষ
আমার মাটির স্বাদ চাই, আয়রণ থাকুক
জমির প্রোমোটর হয়ে যাবো এবার।

সাধু পুরুষটি জানালেন, জল সবই জল, সবই প্রকৃতি
ওঁ গঙ্গেঁ চ যমুনা চ গোদাবরী সরস্বতী
বেটা হতাশা মে ঈশ্বর নাম কি পানি পিও
সব ঠিক হো জায়েগা।

হতাশা আমি কি খাবো তবে?
প্রেম নেই, রাজনীতি ভুল, ঈশ্বর খোঁজা হ'লনা
কবিতার মিনারেল খেয়ে যাচ্ছি
এখন সবাই বলছে — কবিতাগুলি ঋদ্ধ নয়
হতাশা আমি কোন জল খাবো তবে?
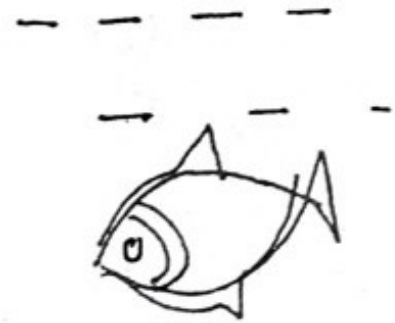
।। দুঃসময়ের জার্নাল ।। — উত্তম দত্ত

তোমার প্রতিমা আমি ভেঙ্গেছি গোপনে প্রতিদিন
তারপর সেই কোন্ ১৯৮২ সনে শেষ হলো অতিমর্ত্য খেলা
ভৌতিক নাচের আসর থেকে তুমি ফিরে গেলে
সন্ধ্যার হলুদ বাগানে
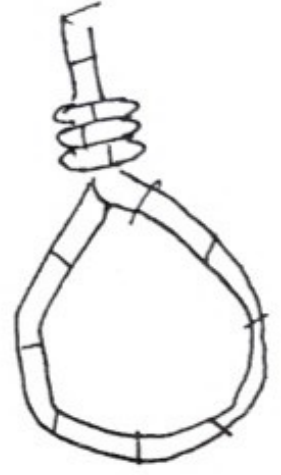
সেই দিন শুধু তোমারি জন্যে অপরাধ ও ক্ষমার মাঝখানে
আমি জনান্তিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম
আর স্বপ্নের মধ্যে এক নাবালক পুরোহিত এসে
আমাকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিল শেষ রাতে

আমি কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারিনি
হাতে বন্দুক আর প্রেক্ষাপটে অরণ্য থাকলেই
মানুষ মাংসাশী হয় না ....

স্বপ্ন ও গল্পের কথা

সমীর চট্টোপাধ্যায়
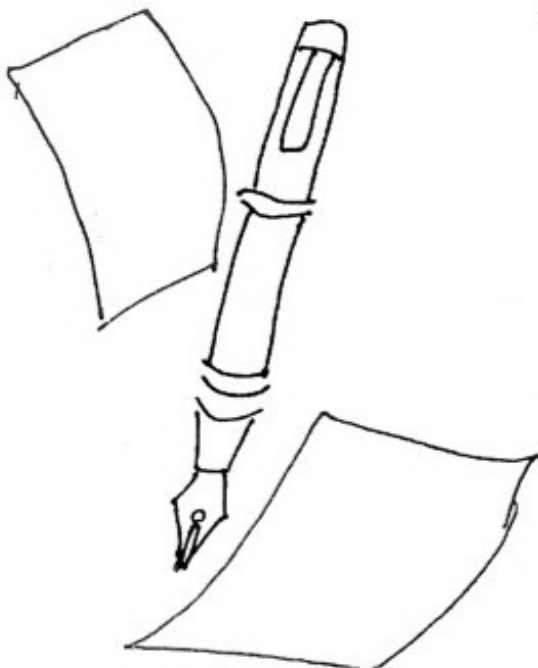
স্বপ্ন ও গল্পের কথা কিভাবে বলি ?
দর্শন ও জিজ্ঞাসায় যে পরিক্রমা—
আমাদের সন্ধ্যা- সকাল, আত্মদহনের আলো
কাকে সনাক্ত করব !

আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ ও মানুষ—
কাগজে পদ্য লেখা শব্দের মালায়
কত সময়, কতবার কেঁদে উঠেছিল ....

অগ্নিহোত্রী, যদি তুমি —

শুভাশিস চৌধুরী
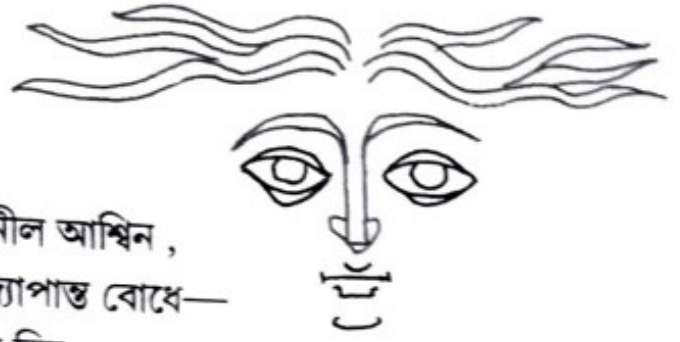
অগ্নিহোত্রী , তুমি যদি বলো—
সোনা রোদে মেঘধুয়ে হয়ে উঠো সুনীল আশ্বিন ,
আলোর হৃদয় ছুঁয়ে, আমি এক আদ্যোপান্ত বোধে—
আকাশ কবিতা হতে পারি। শ্রাবণের দিন —
আন্তরিকতার গন্ধে যে শব্দ পাঠায় রঙীন ,
আত্মীয়তা গড়ে নিয়ে সেই সব শব্দের শরীরে
বাক্যের মহোৎসবে, অগ্নিহোত্রী! আমি হ'তে পারি
আশ্বিন আকাশে এক নীলকণ্ঠ অনন্ত - বিহারী
কবিতার কাকলীতে হৃদয়ের সর্বাঙ্গীন রোদ।
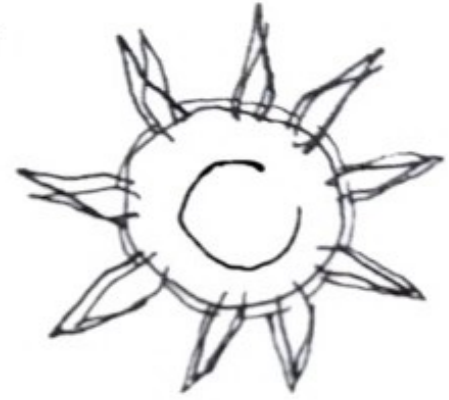
যদি বলো, অগ্নিহোত্রী, যদি তুমি বলো—
হ'তে পারি আন্তরিক আশ্বিনের আদিগন্ত বোধ,
জীবনের শব্দ বেছে, হৃদয়ের বাক্যের গভীরে
মুছে দিতে পারি আমি ভিন্ন ঋতু, বিভিন্ন বিরোধ।

আমি যে মেয়ে

— সন্তোষ সিংহ

আমার তখন গা-গুলোনো, আমার তখন বমি
তোমার তখন রৌদ্র বড়, বিকেল ছিল কমই
তবুও মনে গড়েছ তুলে গোপন গোলাঘর
ইচ্ছে-ফসল রাখবে তুলে পরম নির্ভর
আমার তখন বৈরাতীনাচ ঢাকের কুর্ - কুর্
শেষ যে তোমার পাইনা খুঁজে মধুর হে মধুর
আমি যে মেয়ে আমার চেয়ে কে আর অনুভব
আমি যে ঊষা প্রথম ভাষা ভাষার গূঢ় স্তব

মেঘালয়ের পথে

নিত্য মালাকার

এই সবুজ পাকদন্ডীর পাহারটার পরেই পড়বে হয়তো ঝিল
এবং কুয়াশা-ঘেরা জলের বিপুল ইচ্ছে
আমি কি তবে এখানেই নেমে হেঁটে চলে যাবো
ক্রমশ রাত্রির দিকে

এরকম প্রশ্ন - জিজ্ঞাসা নিয়ে আসেনা কেউ
অনুচিত অবাঞ্ছিত দৃশ্যাতিরেক কোনো স্বপ্ন-কল্পনার গড়খাই
তবু এতদূর বলেই হয়তো বা একলার ইচ্ছে বিপজ্জনক মিষ্টি
এ-কোল সে-কোল ঘুরে উঠে যাওয়া
লাস্কারি বাসের সিটে নতুন যাত্রীর চোখে যে রকম অভিনব
হঠাৎ ঝর্ণার পাশে
ভেতরে সবুজ - করা গানের সুঘ্রাণ নিয়ে ভাসমান চলে যাবো
মেঘালয়ের এখনো তরুণী এই অববাহিকাটিকে সঙ্গ দিতে দিতে।
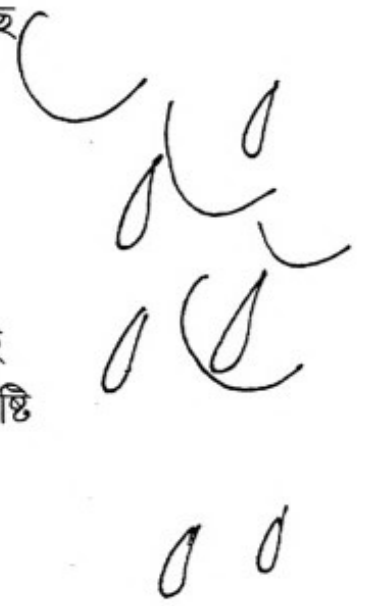
বা তারপরেও কিছু

রামকান্ত রায়

শুধুমাত্র চাল - ডাল তেল - নুনে বিহ্বল হয়ে
কবিদের সংসার চলে না

চোখের পাতায় তাদের আশমান- ই শাড়ী
মনের গহনে তাদের সূর্যাস্তের কাঁপন
সূর্যও কী কাঁপতে কাঁপতে ডুবে যায়
গহন অন্ধকারে ...
বা তারপরেও কিছু ? ?

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

অম্লান জ্যোতি মজুমদার

> " বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ততটা আলোচিত নন যতটা তার হওয়া উচিত ছিলো । এ বিষয়ে বাংলাভাষীদের অনাগ্রহ আমাদের সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সাহিত্যের দূরত্বই প্রমাণ করে । "

যেমন তাঁর পক্ষেই সম্ভব, একটি শীর্ণ , নিরাভরণ পুস্তিকা আর দুটি ফোলডারে অনধিক ত্রিশটি কবিতা দিয়েই মাৎ করে দেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গত দুই যুগ ধরে এই ব্যাপারটা কয়েকবারই ঘটেছে। যেহেতু তাঁর সাধ ছিলনা কবিতা নিয়ে অলস -বিলাসে , ন্যাকামিতে,কিন্তু সততা ছিল নিজের কাছে , কবিতার কাছে , কবিতা তাঁর কাছে অতি সহজে ধরা দিয়েছিলো। গ্রন্থের পরিপাট্যের অপেক্ষা করে না, কেবলমাত্র ছাপা হবার অপেক্ষা, এমনি সহজ।

কিন্তু আদৌ সহজ নয় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতে কোন 'লেবেল' আটকে দেওয়া। হয়ত এস্টাবলিশমেন্ট বিরোধী বলা যেত, অথবা শ্রী চট্টোপাধ্যায় যেমন অভিমানভরে একাধিকবার বলেছেন , ' ব্রাত্য ' কবি, এই আখ্যা দেওয়া যেতে পারত। ব্রাত্য, কেননা কোন পংক্তিতেই তাঁর ঠাঁই হলোনা এতদিনে , সুপ্রতিষ্ঠিত পুরস্কৃত বামপন্থীদের দলে নয় , খ্যাতিমান মুক্তমতিদের দলেও নয়। বস্তুতঃ এই ব্যাপারে , এই এক ব্যাপারেই মাত্র , বলা যেতে পারত একটা বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য হয়ে গেছে।

সহজ যে নয় তার কারণ হলো বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সততা । কেবল এস্টাবলিশমেন্ট- বিরোধিতার জন্য কবিতা লিখতে তাঁর আগ্রহ ছিল না। এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট বলেছেন ঃ " শুধু এস্টাবলিশমেন্ট - বিরোধিতা একজন সৎ লেখককে কি সাহায্য করতে পারে আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা ।" আর যেহেতু মধ্যবিত্তসুলভ বিপ্লবে তাঁর প্রবল অনীহা তাঁর পক্ষে ' যথার্থ ' বিপ্লবের কবিতাও লেখা সম্ভব হয় নি। ঐ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন ঃ " সোনার পাথরের বাটি যেমন হয় না (আপনারা তো তাই বলতে চাইছেন) , তেমনি আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে থেকে বিপ্লবী সাজা চলে না। " যেখানে লংমার্চের ছিঁটেফোঁটাও নেই সেখানে মাও -সে - তুং এর মত লংমার্চের কবিতা লিখতে তিনি চাননি।

অপরপক্ষে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় কোন প্রকার 'কমিট্‌মেন্ট' নেই (রাজনীতির কাছে পাওয়া এই শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই) এবম্প্রকার কোন তত্ত্ব এই আলোচনার প্রতিপাদ্য নয়।

১৩৭০ এর বৈশাখ - আষাঢ় সংখ্যা ' উত্তরসুরী ' তে প্রকাশিত 'কবির ভাষ্য'- তে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন ঃ " আমি কবিতা লিখছিনা — কিন্তু চারদিকে প্রচন্ড মার ও অমানুষিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি। মানবধর্ম পালন করছি। " এখানেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। মানবধর্মই তার কবিতার সবচাইতে বড় অঙ্গীকার। অতএব প্রতিবাদের কবিতা ; কখনো অন্য সকলের সঙ্গে মিলে, কখনো সম্পূর্ণ একলা , মানুষের সর্বনাশের দিনে ছোট ছোট ফোল্ডারের মাধ্যমে তাঁর প্রবল প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। যদিও তিনি জানেন , ' একজন কবি যখন প্রচলিত কোন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠেন এবং একটি কি দুটি কবিতা নয় , অনেক কবিতা দিয়ে তার প্রতিবাদকে জোরালো করতে চান , তখন মাঝে মধ্যেই তার কবিতার বাঁধন আলগা হয়ে যায় , বারবার ব্যবহারের ফলে কিছু শব্দ

তাদের ধার হারিয়ে ফেলে।" কিন্তু এতেও সবটা বলা হয় না। কেবলমাত্র প্রতিবাদই কি তার অভীষ্ট ছিল? কবি, যিনি সহৃদয়, সামাজিক, অবশ্যই সমাজদেহে অসুখ দেখে বিচলিত হবেন ; কিন্তু ক্রোধ ছাড়াও তার অন্য কিছু দেবার থাকে। পূর্বোলিখিত কবির ভাষ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কাঙ্খিত কবিতা সম্বন্ধে লিখেছিলেন ঃ " সেই কবিতা যা আমাদের মনের কলুষকে ধুয়ে দেয়, আমাদের অমল করে, অথবা প্রচন্ড মারীর রক্তবমনের সময় যা বিশল্যকরণীর মতই আমাদের সকল যন্ত্রণাকে অমৃত করে ; আমি সেই কবিতা যদি একটিও লিখতে পারি তা হলে, এবং তখনই আমি বলতে পারব — আমি একটি কবিতাই লিখেছি। " ভরসা করি এমন কথা বলা বাহুল্য হবে না যে বিশল্যকরণীর অন্বেষণই তাঁর সাধনা, তিনি ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হন নি।

পরিণামে আমরা দেখতে পাব বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাজনৈতিক কবিতার পাশাপাশি রচনা করেছেন প্রেমের কবিতা। এবিষয়ে তাঁর কবিতা কখনোই প্রগতিপন্থীদের কবিতার সমান্তরাল পথে চলে নি। শ্রী চট্টোপাধ্যায় বলেছেন ঃ ' আমার রাস্তা প্রথম থেকেই ছিল ভিন্ন। আজও তাই। 'মুখোশ', ' প্রভাস ' অথবা আমার ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতাগুলি থেকে আমি কোনওদিন মুখ ফিরিয়ে নেব না। আজও যদি তাদের কাছাকাছি কোন প্রেম বা অপ্রেমের কবিতা আমার কলম থেকে বেরোয়, তাদের আমি অবশ্যই পত্রিকায় ছাপতে দেবো। বইয়ে ছাপাবো।"

তিনটি কবিতাগুচ্ছের ('ন্যাংটো ছেলে আকাশ দেখছে' — ফোল্ডার ; ' নীলকমল লালকমল' —ফোল্ডার ; ' দিবস ও রজনীর কবিতা ' — গ্রন্থাকারে) জন্য এতবড়ো ভূমিকা ফাঁদতে হলো ; কেননা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ততটা আলোচিত নন যতটা তাঁর হওয়া উচিত ছিল। এ বিষয়ে বাংলাভাষীদের অনাগ্রহ আমাদের সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সাহিত্যের দূরত্বই প্রমাণ করে।

এই তিনগুচ্ছ কবিতা, যার দুটি বাদে বাকি সবকটি ১৯৭৩-৭৯ এই ছ'বছরে লেখা, মনে করিয়ে দেয় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এখন ঘরে ফেরার দিন। ' এই কি ক্ষমা চাওয়ার সময়। অথচ দূরে ঘন্টা বাজছে, আর দেরী নয় যেতেই হবে। " ('তোমার কাছে'/ ' দিবস রজনীর কবিতা ' কাব্যগ্রন্থ) অনেক তো দেখলেন, জানলেন অনেক, এখন এক বিষাদ ধীরে ধীরে তার কবিতায় ছড়িয়ে যায়, ক্রোধ প্রায় অবসিত। কিন্তু অবসন্ন নয়। বয়স তাঁর ক্ষমতা হরণ করে নি। প্রতিবাদের কবিতা তিনি লিখছেন না এমন নয় — কিন্তু প্রতিবাদের ধরনটা পাল্টে গেছে। পূর্বের মতো উচ্চকিত ভাষণের পরিবর্তে এখন আরও মিতবাক এবং সংহত তাঁর কবিতা, পরিণামে অমোঘ। ' কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস এই বাংলাদেশ ' (নীলকমল, লালকমল) কবিতাটি তো আক্ষেপ। কিন্তু গোবিন্দ দাসের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে লেখা কবিতাটির পাশাপাশি রাখলে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষা যে ক্রমে নিরাভরণ ঋজুতার দিকে এগোচ্ছে স্পষ্ট বোঝা যায় ঃ
' যে কবি তাঁর মনুষ্যত্বে / অটল ছিলেন সর্বনাশে, / তাঁর চিতায় মঠ দিতে কেউ / ছিল না এই বাংলাদেশে। যাঁরা ছিলেন দেশের মানুষ, / তাঁদের তখন অনেক কাজ। '

তেমনি যদি পাশাপাশি রাখি ' রুটি দাও ' (উলুখড়ের কবিতা) আর ' মানুষের মুখ ' (নীলকমল লালকমল) তাহলেও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় একটা পরিবর্তন ধরা পড়ে। প্রথমোক্ত কবিতাটি শিবানী রায়চৌধুরী এবং রবার্ট হ্যামসন কর্তৃক অনূদিত এবং 'টাইমস্ লিটরিরি সাপ্লিমেন্ট - এ' (২০ জুন ১৯৮০ সংখ্যা) প্রকাশিত যতই নাটকীয় শোনাক — অতিকথন মাত্র। অপরপক্ষে ' মানুষের মুখ ' কবিতাটি দেখা যাকঃ

রুটিতে একটু নুন ...
আকাশের নীচে

পৃথিবী রূপকথার মতো ।
কিন্তু আকাশ নেই ;
রুটি নেই —
যদিও চোখের জল লবণ
এখনও আঁকে
পাষাণপুরীর বন্দী
মানুষের মুখ (৭ নভেম্বর , ১৯৭৫)

দ্বিতীয়টি শ্রেষ্ঠতর এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নীলকমল , লালকমল — শিশুদের এই দুই প্রতিভূর জন্য আর্ন্তজাতিক প্রহসন (গোটা ১৯৭৯ ধরে এই প্রহসন প্রত্যক্ষ করা গেছে) তাঁর পছন্দ ছিল না কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ এখন সুলভ উপমার পরিবর্তে মন্ত্রের মত শোনায় ঃ

" একটা পৃথিবী চাই / শুকনো কাঠের মত মায়েদের / শরীরে কান্না নিয়ে নয় , / তাঁদের বুক ভর্তি অফুরন্ত ভালোবাসার / শস্য নিয়ে "

আর নীলকমল , লালকমলের শোচনীয় অবস্থার কথাও এর চেয়ে ভালো বলা যেত না ;

" কি করো তুমি বিকেলবেলা ,
খেলো না ফুটবল ?
তোমার দেশে খেলার মাঠ নেই ?
তোমার বিকেল শুধু জেলখানা ! "

বয়সের অপর শর্ত এই তা পিছনের দিকে তাকাতে বাধ্য করে — সেইসব আশার ফসল যা একদা করতলগত মনে হয়েছিল তা ক্রমশঃ ধূসর হয়ে সরে যেতে থাকে —

" কিন্তু হিসাব মেলাতে গেলেই মাথা খারপ হয়ে যায়, / বুকের ভেতর একটা বিশ্রী ধাক্কা লাগে।/ নভেম্বর দিবস আর হো - চি - মিনের সমস্ত জীবন ধরে লড়াই । হিসাব মেলেনা , কিছুরই হিসাব মেলে না/ কোথাও মানুষ উঁচু হতে / হঠাৎ ভয়ঙ্কর বেঁটে হয়ে যাচ্ছে । কোথাও — / যা আমার নিজস্ব পৃথিবী , আমার স্বপ্নের পৃথিবী। (পৃথিবী - ১৯৭৯)

বিঃ দ্রঃ জর্জ স্টেইনার একসময় ছোট পত্রিকার চারটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছিলেন। তার মধ্যে একটি হল ঃ অনতিপূর্ব কোন সাহিত্যকর্ম বা অল্প - আলোচিত কোন সাহিত্যকর্মকে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর গোচরে আনা এবং তাকে বিস্মৃতির থেকে রক্ষা করা । এই কথা কয়টিকে মাথায় রেখে শ্রী অম্লান জ্যোতি মজুমদার মহাশয়ের লেখা ও বেশ কয়েকবৎসর পূর্বে একটি ছোট পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটিকে লেখকের অনুমতিক্রমে পুনরায় মুদ্রণ করা হল।

জীবনানন্দ ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ মিল-অমিলের সন্ধানে

নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য

উত্তরণের পথ দুজনের ক্ষেত্রেই একই— এ ভাববাদের পথ — আবার এ কোনো নতুন পথ নয় — আমাদের সবার জানা পুরাতনী অথচ নিত্যকালের পথ।

(১)

* ''জীবনানন্দ এবং বিষ্ণুদে, বিশেষ করে এই দুই অগ্রজ কবির কাছে আমি কবিতার ভাষা শিখেছি, যে কবিতা এখন আমি লিখে থাকি।'' — বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* '' আমার কবিতা কোনদিনই চল্লিশের প্রগতিশীল কবিতা বা কবিদের কাছ থেকে অন্ন বা জল আহরণ করে নি। বরং আমি নিজের কবিতাকে যতটা বুঝি , আমার কবিতার শিকড় অন্য খানে। সেখানে আজও যাঁরা জল সিঞ্চন করছেন তাঁরা সবাই দলছুট একক কবি — যেমন জীবনানন্দ, তারপর নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ।'' — বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তাঁর কবিতায় পূর্বজ কবিদের প্রভাব এবং কবি হিসাবে তাঁর নিজস্ব অবস্থান নির্ধারণ প্রসঙ্গে ১৯৮০ সালে তৎকালীন 'নান্দীমুখ' পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন শ্রী মিহির চক্রবর্তী ও শ্রী দিলীপ পাল মহাশয়। উদ্ধৃত স্বীকারোক্তিতে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অকপটে স্বীকার করেছেন যে তিনি জীবনানন্দের কাছে তাঁর কবিতার ভাষা শিখেছেন। শুধু তাই নয় তিনি তাঁর কবিতার শিকড়আবিষ্কার করেছেন জীবনানন্দের সিঞ্চিত ভূমিতেই। এবং তিনি মিথ্যাচার করেননি। যদিও খুঁজলে, এই দুই স্রষ্টা-শিল্পীর সাহিত্যকর্মের মধ্যে পার্থক্য পাওয়া যাবে প্রচুর। আর দু'জন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্যটাই স্বাভাবিক; কেননা এক্ষেত্রে পার্থক্যটাইতো স্বাতন্ত্রের পরিচায়ক। বিশিষ্ট কণ্ঠের উচ্চারণ জানি বিশিষ্টই হয়। নানা দিক থেকে জীবনানন্দ ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাই স্বভাবতঃই স্বতন্ত্র। এই দুই প্রতিভার মিল বা সাদৃশ্যের দিকগুলিও খুব কম জোড়ালো নয়; বরং বহু স্বাতন্ত্রের মাঝখানে সাদৃশ্যের দিকগুলি একটি ধারা বা পরম্পরার বাহক হয়।

(২)

বীবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন; তিনি কবিতার ভাষা শিখেছেন জীবনানন্দের কাছে। এ স্বীকারোক্তির প্রমাণ মেলে তাঁর প্রথম দিককার কবিতাগুলিতে যার একটা বড় অংশ সংকলিত হয়েছে ' গ্রহচ্যুত' কাব্যগ্রন্থে। এই সময়কালে লেখা 'ক্লান্তি ক্লান্তি' কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করছি ঃ

''এমন ঘুমের মতো নেশা ফেলে দিয়ে
কে চায় জীবন!
এমন শান্তির মতো সঞ্চয় ফুরিয়ে
কে চায় জীবন!
ক্লান্তি, ক্লান্তি, ক্লান্তি দিল জীবন জুড়িয়ে,
এ - হৃদয় ঘুমের মতন।
এ - হৃদয় শান্তির মতন।''

কবিতাটিতে হুবহু জীবনানন্দের ছাঁচ যে অনুসৃত হয়েছে, তা সহজে বোঝা যায়। জীবনানন্দের অসাধারণ লিরিকধর্মী গীতিময়তার স্বাদ এখানে স্পষ্ট। এমন কি ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'রাণুর জন্য' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত'মুখোশ' কবিতাটির মধ্যেও এই ধাঁচ লক্ষণীয় ভাবে ধরা পড়ে ঃ

" কার যেন স্মৃতিমুখ পাঠায়েছে আমাদের মতো কোনো প্রণয়ীর কাছে ;
সুন্দর কি কুৎসিত জানি না, তবু জানি মার্চেন্টের মারে নেই এই সব খুঁত।"

কিন্তু ক্রম পরিণমনের সাথে পাল্লা দিয়ে শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় নিজস্ব রীতি ও ছাঁচ গড়ে উঠতে থাকে। পরবর্তী কালে তাঁর কবিতায় এই গীতিময়তা নষ্ট হয়ে গেল,এমনটা নয়। কিন্তু জীবনানন্দ অনুসারী একই ধাঁচের তীব্র গীতিময়তা আর প্রায় থাকলো না। একটা বড় অঙ্কের কবিতায় ভাষা ও চাবুকে পরিণত হল; যেখানে জীবনানন্দ তাঁর শেষ দিকের কড়া ও পোড়-খাওয়া কবিতা গুলোতেও প্রায় একমুহূর্তের জন্যও এই গীতিময়তা থেকে বিচ্যুত হন নি, এমন কি '১৯৪৬-৪৭' অথবা 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতাতেও না।

(৩)

আবার এই দুজন কবির কবিতাতেই ' ক্লান্তি' একটি বড় অনুভূতি। জীবনভর ক্লান্তি , অবসাদ, ক্রমাগত হাঁফিয়ে উঠার কথা দুজনই ব্যক্ত করেছেন। দুজনের ক্ষেত্রেই এই ক্লান্তি ব্যক্তিমানুষ ও সামগ্রিকভাবে মানবের অপ্রাপ্তি ও বিপন্নতা বোধ থেকে জাত। সময়ের যন্ত্রনার মধ্যে এর বীজের বড় অংশ লুকায়িত। 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ' (জীবনানন্দের ভাষায়) বা ' সময়ের গায়ে জ্বর' (শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়) যে এই দুজন কবিকে ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত করেছে, এতে সন্দেহের অবকাশ কিছু নেই। সত্যি তো আমরা যা চাই তা পাই কোথায়? জীবনানন্দে তাই ' কি চেয়েছি? কি পেয়েছি? গিয়াছে হারায়ে'। আর বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলবেন ঃ " আমি চেতনায়, অবচেতনায়, সুচেতনায় / কোথাও নির্মল জলপাই নি, কোথাও নদীকে পলিমাটির মতো / মনে হয়নি আমার, কিংবা রাত্রিকে সহজ অধিকারের মতো"। বিচার করলে দেখা যাবে এ ক্লান্তি সত্যি অপ্রাপ্তির; আবার এই ক্লান্তি মনের, অসাফল্যের, বিপন্নতার, সময়ের ও সমাজের বিহ্বল রসায়ণ সঞ্জাত। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহু কবিতাতেই এই অনুভূতি ব্যক্ত। যেমন ধরুনঃ

"ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হয়, নিরানন্দ স্বাধীন স্বদেশ
মৃতের মতন প'ড়ে থাকে ! চারদিকে অসীম ক্লান্তি, ক্লান্তি শুধু!"

(অন্নহীন ভাষাহীন)

অথবা ঃ

" চারদিকে ক্লান্তির শব্দ, শুধু পাতা ঝরে
আর অন্ধকার, আর গভীর কুয়াশা;
আর মার-খাওয়া স্বপ্ন, রুগ্ন প্রেম, শীর্ণ ভালোবাসা ..."

(মে দিন - ১৯৬৫)

একই কথা জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও সত্য। তাঁর 'এই সব দিন রাত্রি' কবিতায় ছিন্নমূল মানুষের ব্যর্থ অন্ধকার, বিচিত্র মৃত্যুর মধ্যে ঘনিয়ে উঠেছে বিষাদ ও ক্লান্তি ঃ

" মনে হয় এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো।
এই খানে
পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারার দেশে
এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে।"

একই ভাবে ' বিভিন্ন কোরাস' কবিতায় চারিদিকে প্রতিভাত হয়ে উঠা নদী ' ডাইনে আর বাঁয়ে/চেয়ে দ্যাখে মানুষের দুঃখ, ক্লান্তি, দীপ্তি, অধঃপতনের সীমা; '। আর ' উত্তরপ্রবেশ' কবিতায়, ' কেন ক্লান্তি তা ভেবে বিস্ময়'।

'পৃথিবীর বাধা, এই দেহের ব্যাঘাতে' অথবা 'বয়সের শ্রান্তির বালুচর ' ও বিষন্ন অতীত রোমন্থনের বিষাদ—এই সব গ্লানি সইতে সইতে দু-জন কবিই ক্রমঅবসরের দিকে ঝুঁকে গেছেন মাঝে মধ্যেই। কবি জীবনানন্দ যদি লেখেন :

" ট্রামের লাইনের পথ ধরে হাঁটি : এখন গভীর রাত
কবেকার কোন্ সে জীবন যেন টিটকারি দিয়ে যায় /
'তুমি যেন রড ভাঙ্গা ট্রাম এক — ডিপো নাই — মজুরির প্রয়োজন নাই /
কখন এমন হলে হায়।

তবে বীরেন্দ্র চট্টোপাধায় বলবেন :

' যতদূর প্রাণ যায় / বালুচর .... / বয়সের শ্রান্তির/ বালুচর।' — (গোধূলি যাত্রা)

অথবা বলবেন : 'ব'লো না কথা পাখি, আস্তে ঝরো ফুল ; / ঘুমের রাত আসে। শান্তি, শান্তি। (প্রভাস)

এত সাদৃশ্য সত্বেও অন্তত একটি স্থানে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও জীবনানন্দের ক্লান্তি বোধ বেশ কিছুটা পার্থক্য পাওয়া যাবে। বীবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে এ ক্লান্তি যে কোনো ভাবেই হোক্ কাঙ্খিত প্রাপ্তি না হওয়ার কারণে; এর বাইরে নয়। আর জীবনানন্দে প্রাপ্তিহীনতা বড় কারণ হলেও, এর বাইরেও বুঝি আরও কিছু বলবার থাকে। তাঁর ' আট বছর আগের এক দিন' কবিতার কয়েক ছত্র তোলা যাক :

" নারীর হৃদয় - প্রেম - শিশু — গৃহ— নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয় , স্বচ্ছলতা নয় —
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত — ক্লান্ত করে;"

পার্থিব সব প্রাপ্তির পরেও বুঝি আরও কোনো বিপন্ন বিস্ময়ের অবকাশ আছে; তা থেকে ক্লান্তি ও বিপন্নতা; এ চাওয়া পাওয়ার পরিধির বিষয় নয়; অথচ ' আমাদের অন্তর্গত রক্তের' ভিতরের বিষয়। রক্তের অন্তর্নিহিত এই ক্লান্তি সব মানুষের সর্বজনীন বিপন্নতা; এর আরোগ্য নাই; এ থেকে মুক্তি নাই; তাই এ আরও ভয়াবহ। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ক্লান্তিতে অন্তত এই ' ভয়' নেই।

(৪)

তৃতীয় যে পার্থক্য-অপার্থক্যের দিকটি নিয়ে কথা বলতে চাই, তা এই দুই কবির মৃত্যু চিন্তাকে নিয়ে। এইখানে একজনের ধারণাকে আর একজনের ধারণার সাথে মেলানো যায় কিছুদূর পর্যন্ত। আবার, কিছুদূর মিলের পরে অমিলটিও বড়ো-সড়ো। মৃত্যুর রূপটিকে দুজনেই অমোঘ হিসেবেই দেখেছেন। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যদি বলেন, 'ঐ মহাবর্ষণের শান্তিতে একদিন/চলে যাব ' (কবিতা : 'চলে যাব' - জুলাই ১৯৮১) অথবা মৃত্যুর শীতল হাতকে যদি বলেন , " জানি, তুমি মাত্রাহীন স্পর্ধার প্রতীক , তোমার তূণীরে আছে ধ্বংসের অমোঘ অস্ত্র ; " — তবে জীবনানন্দের কবিতাতে পাওয়া যাবে : ' তোমার বুকের থেকে

চলে যাবে তোমার সন্তান' অথবা ' সময়ের কাছে ' কবিতায় লেখা ঃ ' আজকে মানুষ আমি তবুও তো — সৃষ্টির হৃদয়ে / হৈমন্তিক স্পন্দনের পথের ফসল ' — এর মতো বহু পঙ্‌ক্তি।

দুজনের ক্ষেত্রেই এই মৃত্যুচিন্তা সময়বিশেষে তাঁদের ক্লান্তি থেকে জাত ; অনেক ক্ষেত্রে তা আবার এককতার যন্ত্রণা থেকেও জাত ; আবার সময়ের বিপন্নতাও এই দুই কবিকে মৃত্যুমুখী করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই সবগুলো কারণের মিশ্রপ্রতিক্রিয়াও ভয়ানকভাবে দুজনকেই মৃত্যুমুখী করেছে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ' তোমার কাছে ' ও ' প্রভাস ' কবিতা দুটিতে , এবং জীবনানন্দের ' উত্তরপ্রবেশ ' , ' সময়ের কাছে' অথবা ' বিভিন্ন কোরাস' এ যে মৃত্যুর শব্দ আমাদের বিষণ্ণ করে তা এইসব কারণ থেকেই জাত। যদিও বিশ্লেষণের সরলীকরণ , তবুও এইভাবে দেখলে মৃত্যুচেতনার ক্ষেত্রটিতে এই দুজন কবির সাদৃশ্যের সহজ দিকটি সহজে বোঝা যায়। আসলে, এ পর্যন্তই যা-কিছু মিল । বরং বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে এক্ষেত্রে এদের বৈসাদৃশ্যের দিকটি। এদের এ'কজন মৃত্যুকে অমোঘ জেনেও হাল ছাড়েন না,বরং মৃত্যুকেই পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছোড়েন ; মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তিনি লড়বেন ; আর অন্যজন মৃত্যুকে বাস্তবে অমোঘ জেনেও শেষ পর্যন্ত ভাববাদের দ্বারা চালিত হয়ে মৃত্যুকে শেষ অর্থে চূড়ান্ত বলেই মানেন না; আর তাই লড়াইয়ের প্রয়োজন অনুভব করেন না। প্রথমোক্ত তীব্র লড়াকু মানুষটি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; আর দ্বিতীয় মানুষটি জীবনানন্দ।

' মৃত্যুর শীতল হাত ' , ' ঠাকুরপুকুর হাসপাতালে ', ' যাবো ঠিকই ' , ' মৃত্যু তুমি ', ' আর এক আরম্ভের জন্য ' কবিতাগুলি পাঠ করলে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই লড়াকু মেজাজ সহজেই বোঝা যায়। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ' শ্রেষ্ঠ কবিতার ' দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন ঃ " চারদিকের নরকের মধ্যেও মানুষ তাই স্বপ্ন দেখে, তখন স্বয়ং মৃত্যু এসেও যদি তার সামনে দাঁড়ায় —— সে তাকে সহজে পথ ছেড়ে দেয় না , প্রশ্ন করে। " ' মৃত্যুর শীতল হাত ' কবিতাটিতে তাই স্পর্শে-উপলব্ধ মৃত্যুকে এমন অমোঘ প্রশ্ন করতে চেয়েছেন কবি , যার উত্তর অমোঘ মৃত্যু পর্যন্ত দিতে গিয়ে বিমূঢ় হবে ঃ " জানি , তুমি মাত্রাহীন স্পর্ধার প্রতীক , তোমার তূণীরে আছে ধ্বংসের / অমোঘ অস্ত্র ; কিন্তু আমারও কিছু প্রশ্ন আছে , তুমি যার উত্তর জানো না। " তাঁর মতে মৃত্যুকেও ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হয় , সময়ে ছোটখাটো হারও সইতে হয় , যদিও শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর জিৎ অবশ্যম্ভাবী ঃ

" মৃত্যু কারো জন্য বসে থাকে না , কথাটা ঠিক নয়। মাঝে মধ্যেই তাকে অপেক্ষা করতে হয়। /
সে জানে , শেষ পর্যন্ত তারই জিৎ। কিন্তু ছোটখাটো হার , মানুষের অদম্য / ইচ্ছার কাছে /
তাকে মেনে নিতে হয়। " (কবিতা ঃ ' মৃত্যু তুমি')

আর তাই স্বেচ্ছাচারির মতো কবি বলতে পারেন ঃ

" যাব ঠিকই , পায়ে হেঁটে , যেদিন আমার সত্যিকারের সময় হবে " (কবিতা ঃ " যাব ঠিকই ")

জীবনানন্দে এই লড়াকু মেজাজ নেই ; আছে শান্তিতে ঘুমাবার , কোমলভাবে মৃত্যুকে নেওয়ার বাসনা। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মৃত্যু সত্যি মৃত্যু , এর পরে আর ভাববার বিশেষ অবকাশ নেই ; যদিও তাঁর প্রত্যাবর্তন কবিতায় একটি গাছ তার সারা জীবনের কাজ শেষে মাটির কাছে সম্পূর্ণ নতজানু হয়েছে — " হয়তো সে একদিন / মাটির গভীরে / আলো হবে ... " —— এরকমই আশা ; এখানে ' হয়তো 'শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ। সংশয় রয়ে গেছে — সত্যি আলো হবে তো! আসলে মৃতুর পরে আলো হয়ে মৃত্যুর অন্ধকারকে পরাজিত করা যায় কিনা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তা জানেন না। কিন্তু চিরভাববাদী জীবনানন্দ জানেন।

মৃত্যুর পরেও তাঁর মৃত্যু বলে কিছু নেই। আর তাই তিনি মৃত্যুকে সহজ করে নিতে পারেন। চরম মৃত্যু তাঁর কাছে, মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার চরম আশ্রয় এনে দেয়। তাই 'আমি যদি হতাম' কবিতায় জীবনের খন্ড খন্ড অপমানকর মৃত্যুগুলোকে সহসা অতিক্রম করতে চেয়েছেন পিস্টনের উল্লাসে বাহিত একক চরম মৃত্যু লাভের মাধ্যমে। খন্ড খন্ড মৃত্যুকে অতিক্রম করার উপায় চরম মৃত্যু; আর চরম মৃত্যু মানে ঃ

'' তারই নিচে শুয়ে থাকি যেন অর্ধনারীশ্বর '' (' রূপসী বাংলা ' ক্যাব্যগ্রন্থের কুড়ি সংখ্যক কবিতা) ভালোবাসার আলিঙ্গনে নিভৃত, প্রতীকী অর্থে স্বয়ংসৃষ্টিশীল অবিনশ্বর ও অনাদি এই হর-পার্বতীর সমন্বয়ী রূপের মতো হতে চেয়ে নিজেও অবিনশ্বর হওয়ার পথ খোঁজেন না কি কবি ? মৃত্যু চরম, তার পরেও ধারণায় লব্ধ এইরূপ অনবাদি; রাত্রি, মৃত্যু এখানে সব কিছুকেই তো অতিক্রম;তাই তিনি মৃত্যু হনন করেন। আর বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? মৃত্যুকে মাথার উপরে স্থির সত্য জেনেও লড়াই ছাড়েন না বলে আমাদের চমৎকৃত করেন; যদিও মৃত্যু তাকে শেষ পর্যন্ত গ্রাস করবে তিনি জানেন। লড়াই শেষে তখন তিনি চিরতরে ঘুমোতে যাবেন।

(৫)

আবার এই দুই কবির লেখায়'অন্ধকার' ও 'রাত্রি' শব্দদুটি ফিরে ফিরে এসেছে। দুজনই নানা স্থানে 'অন্ধকার' বা 'রাত্রি' -কে নারীরূপে (যা সাহিত্যে স্বাভাবিক) গ্রহণ করেছেন। আবার দুজনের ক্ষেত্রেই অন্ধকারের প্রতীকী দ্যোতনা আছে। আবার পার্থক্যের জায়গাও কম কিছু নয়। জীবনানন্দের অন্ধকার দু- ধরণের ঃ (১) নিঃসৃত অন্ধকার বা রাত্রির মায়ার মতো বা আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো অন্ধকার; (২) অদ্ভুতআঁধার , অস্পষ্ট আঁধার বা লিবিয়ার জঙ্গলের মতো আঁধার। কিন্তু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে অন্ধকার একমুখী, এবং তা উপরে নির্দেশিত জীবনানন্দের দ্বিতীয় ধরণের অন্ধকার ভাবনার সাথে মিল খায়।

উল্লেখিত প্রথম ধরনের অন্ধকার ভাবনা জীবনানন্দে প্রচুর রয়েছে। বিষয়টি স্পষ্ট হবে নিম্নে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলো পাঠ করলে ঃ

(১) ' এ-রকম হিরণ্ময় রাত্রি ছাড়া ইতিহাস আর কিছু রেখেছে কি মনে।' ('একটি নক্ষত্র আসে')

(২) ' থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন' (বনলতা সেন)

(৩) ' আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।' (নগ্ন নির্জন হাত)

(৪) ' নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার রাত্রির মায়ার মতো
মানুষের বিহ্বল দেহের সব দোষ প্রক্ষালিত করে দেয়' (১৯৪৬ -৪৭)

(৫) 'আজ এই পৃথিবীতে এমন মহানুভব ব্যাপ্ত অন্ধকার,
নেই আর? সুবাতাস গভীরতা পবিত্রতা নেই? (১৯৪৬ —৪৭)

(৬) ' চারিদিকে সৃজনের অন্ধকার রয়ে গেছে .... ' (সূর্য্য নক্ষত্র নারী)

(৭) 'ধ্যানের সনির্বন্ধ অন্ধকার এ খনো আসেনি।' (এই খানে সূর্যের)

প্রয়োগের বৈচিত্র থাকলেও এইসব পঙ্‌ক্তিতে অন্ধকার মূলগতভাবে 'সু' বা 'ভালো' অর্থে ব্যবহৃত; তাই কাঙ্খিত। বিস্ময়ে আপ্লুত করে এমনই রহস্যে আহৃত এই অন্ধকার। আলোর সঙ্গে এর বিরোধ নেই ; কেননা এ আলোর সহোদরা; তাই সহস্র নক্ষত্রের উজ্জ্বল ও নিরুজ্জ্বল সমারোহে হিরণ্ময়। আরও গভীর অনুভূতিতে এ অন্ধকার মহানুভব ব্যাপ্ত। এ অন্ধকারে আত্মসংকলন করা যায়; আর মানুষকে প্রক্ষালিত

করে এ অন্ধকার। সৃজনের মহতী বীজ এর বুকেই নিষিক্ত হয়। তিমির হননের কবি জীবনানন্দ এই অন্ধকারকে সঙ্গত কারণেই হনন করতে চান না।

এ ধরনের অন্ধকার চিন্তা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে নেই। বরং শ্রেণীকরণে নির্দেশিত জীবনানন্দের দ্বিতীয় ধরনের অন্ধকার চিন্তাটি তাঁর লেখায় হরহামেশাই লক্ষ্য করা যায়।এখানে অন্ধকার 'কু'বা 'ভয়াবহ' অর্থে (যা সাহিত্যে বহুল প্রচলিত) ব্যবহৃত। প্রথমে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কিছু কবিতার অংশ লক্ষ্য করা যাক ঃ

(১) 'করুণাহীন অন্ধকারে/একাকী জাগে শীতের বাঘ; সমস্ত রাত হলুদ পাতা ঝরে'

('শীত-২' —মানুষের মুখ কাব্যগ্রন্থ)

(২) এমন এক অন্ধকার সময় আসে/ যখন বন্ধুর দিকে দু'হাত বাড়ানোই / আত্মহত্যা।'

(মদন বন্দ্যোপাধ্যায়)

(৩) ' ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হয়, নিরানন্দ স্বাধীন স্বদেশ/মৃতের মতন পড়ে থাকে'।

(অন্নহীন ভাষাহীন)

(৪) 'আঁধারে যায় সীতার চোখের জল/ রাত ফুরায় না।' (আঁধারে যায়)

পাশাপাশি জীবনানন্দের লেখা থেকে এই একই অর্থে ব্যবহৃত 'অন্ধকারের' উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ

(১) ' অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ/ যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দ্যাখে তারা ' (কবিতা ঃ অদ্ভুত আঁধার এক)

(২) ' নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়/ লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।' (কবিতা -'রাত্রি')

(৩) ' আজকে অস্পষ্ট সব? ভালো ক'রে কথা ভাবা এখন কঠিন;/ অন্ধকারে অর্ধসত্য সকলকে জানিয়ে দেবার/ নিয়ম এখন আছে ;' (কবিতাঃ '১৯৪৬-৪৭')

(৪) ' এই বিশ শতকে এখন/ মানুষের কাছে আলো আঁধারের আর এক রকম মানে;/ যেখানে সূর্যের আলো নক্ষত্র বা প্রদীপের ব্যবহার নেই/ সেইখানে অন্ধকার;/... অথবা নিজেকে নিজে প্রতিহত করে ফেলে আলো / সেইখানে অন্ধকার।' (কবিতা ঃ 'এইখানে সূর্যের')

জীবনানন্দ যা কিছুকে এই বিশ শতকের আধাঁর বলেন, বা লিবিয়ার জঙ্গলের মতো আঁধার বা অদ্ভুত আঁধার , বা অস্পষ্ট, সন্দেহপ্রবণ আঁধার বলেন বা যে আঁধারকে 'ঘুরপথ ভুলপথ গ্লানি হিংসা ভয়ের' সাথে একই সারিতে স্থাপন করেন, তাই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে একই অর্থে হয়ে ওঠে 'করুণাহীন অন্ধকার' বা দুঃসময়-সূচক অন্ধকার যে আঁধারে শত সীতার কান্না অরণ্যে রোদন হয়, বন্ধুকে সাহায্য করতে চাইলে বিপদের গন্ধ পাওয়া যায়; 'ভাষাহীণ অন্নহীণ ' স্বদেশের বুকেই তো ঘনায়মান এই অন্ধকার। জীবনানন্দের কাঙ্খিত কান্তিময় আলো বা মহানুভব ব্যাপ্ত অন্ধকারের বিপরীতে স্থিত এই দ্বিতীয় ধরনের অন্ধকারকে জীবনানন্দ হনন করতে চান তাঁর 'তিমির হননের গান' কবিতায়। আর জীবনানন্দকে আওড়ে নিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করেন ঃ ' আর আমরা তিমির বিনাশী মানুষ তোমার (আদিম অন্ধকারের মুখোশ দেবতার) ক্রোধকে অতিক্রম করি / আমাদের প্রেমে।' — ('একটি অসমাপ্ত কবিতা' — ' আমার যজ্ঞের ঘোড়া কাব্যগ্রন্থ')

(৬)

একাকীত্ব আধুনিক কালের (যদি অবশ্য 'আধুনিক' শব্দে আপত্তি না থাকে) বড় সংখ্যক মানুষকেই গ্রাস করছে। তাই জীবনানন্দ ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে যে এককতা বোধ প্রকাশিত তা বরং যুগের সাধারণ

ধর্ম হিসাবেই চিহ্নিত; তা আলোচনার বিশেষ ক্ষেত্র না হলেও এই দুই কবির মনোজগতের উপর তার প্রভাব মিলের ক্ষেত্র হিসাবে উল্লেখের দাবি রাখে। জীবনানন্দ তাঁর 'বোধ' কবিতায় লিখেছেন ঃ

'বলি আমি এই হৃদয়েরে / সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয় !'

আবার তাঁর 'মেঠো চাঁদ' কবিতাটিতে(যদিও কবিতাটির আলাদা ব্যঞ্জনা আছে) অসংখ্য ক্ষয়িষ্ণু ছবির অপসৃয়মান গতি দেখেও আগের মতোই দাঁড়িয়ে- থাকা কবি ও কোন্ আমলের সেই মেঠো চাঁদ একে অপরকে একই রকম 'একা' হিসাবে আবিষ্কার করে একই বিস্ময়ে একই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে ঃ

'... তুমি কেন তবে রয়েছো দাঁড়ায়ে/ একা একা?'

এরই পাশাপাশি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'গোধুলী যাত্রা' কবিতাটির কয়েক ছত্র লক্ষ্য করুন ঃ

' মনের সারস হাঁটে / একাকী।/ যতদূর চোখ যায়/
যতদূর প্রাণ যায়/ বালুচর.../ বয়সের শ্রান্তির / বালুচর।'

বয়সের শ্রান্তি ও একাকীত্ব তো আছেই, সেই সাথে তাঁর কবিতাও তাকে ছেড়ে যেন বিষণ্ণ, বিদায় নিয়েছে। 'শুধু কি বয়েস গেছে ' কবিতায় এই একাকীত্বই প্রকাশিত ঃ

" শুধু কি বয়স গেছে ? আমার কবিতা
আমকে বিষণ্ণ করে বিদায় নিয়েছে। সে বড় একাকী ছিল। আজ আমি একা।"

তাদের এই এককতাবোধের যন্ত্রনা, ও বিহ্বলতা তাদেরকে সৃষ্টিমুখী ও মৃত্যুমুখী দুইই করেছে বলা যায়। এইখানেই এই এককতা বোধের ইতিবাচকতা ও নেতিবাচকতা।

(৭)

আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে এই দুই কবির সমাজমনস্কতা নিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিশুদ্ধ সামাজিক সমস্যাবলী তাদের কবিতায় কতটা স্থান পেয়েছে, এবং এই সব সমস্যাবলী সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়াই বা কি, এবং এই সব সমস্যাবলী থেকে উত্তরণের পথের সন্ধানই বা তাঁরা কিভাবে দিয়েছেন — এই সব প্রশ্নে সমাধান জরুরী হয়ে পড়ে এই দুই কবির সমাজমনস্কতার ক্ষেত্রে মিল - অমিলের স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই দুইজন কবিই তাদের সূচনাপর্বে ভীষণভাবে আত্মমগ্ন ছিলেন। সূচনায় কবিদ্বয়ের ভাবনা-চিন্তার ব্যক্তিগত পৃথিবীতে তৎকালীন জনপ্রিয় সমস্যাবলীর সে-ভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেনি। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে তাঁর 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থটিকে একটি সীমারেখা হিসাবে দেখবার পক্ষপাতি। যদিও কবির ক্রমউন্নয়ণ একটি ধারা বাহিক প্রক্রিয়া; মাঝখানে হঠাৎ করেই এর দুটি সতন্ত্র ভাগে খন্ডিত করণ সম্ভব নয়। 'সাতটি তারার তিমির'- কে আমি সীমারেখা বলছি শুধুমাত্র এই কারণেই যে এই কাব্যের কবিতাগুলি মূলতঃ কবির মূল ট্রানজিশন্ পিরিয়ড্কে ধারণ করেছে। 'সাতটি তারার তিমির '- এর আগে লিখিত চারটি কাব্যগ্রন্থে ('ঝরাপালক,' 'ধূসর পান্ডুলিপি', ' বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী')কবির সমাজমনস্কতা একেবারে ছিলনা— আমি এমনটাও বলছিনা। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'-র চূড়ান্ত আত্মমগ্ন কবি 'ঝরাপালক' -র শেষ পর্যায় থেকেই তো ধীরে হলেও(লয় সবসময় একরকম না হলেও) সমাজমনস্ক হয়ে উঠছিলেন। আর 'সাতটি তারার তিমিরে' সমাজমুখী হওয়ার প্রক্রিয়ায় দম্কা বেগ এসেছে চূড়ান্ত মাত্রায়; এবং সমাজ মনস্কতাতার মূল লক্ষণগুলির মধ্যে একটি হিসাবে সহজেই প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। এ চট্ করে এক ধাপ এগোনো; আর পরবর্তী ' বেলা অবেলা কালবেলা'য় এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ।

' মনবিহঙ্গম ' (প্রকাশ - ১৯৭৯) ও 'আলোপৃথিবী'তে (প্রকাশ —১৯৮২) সংকলিত (এই দুই কাব্য গ্রন্থে বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংগৃহিত গ্রন্থবদ্ধ নয় এমন কবিতা স্থান পেয়েছে) বেশ কিছু কবিতাতেও সমাজ মনস্কতার এই ছাপ সুস্পষ্ট। পরিবর্তনের এই দিকটি খুব ভালোভাবে বুঝেছেন ও ব্যক্ত করেছেন সমালোচক শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তার ' হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর' সমালোচনা কর্মে ঃ

'' *দুনিয়া জুড়ে অকারণ মৃতদেহের স্তুপের সামনে হৃদয়কে চোখ ঠার দিয়ে ঘুমে রেখে শান্তি নেই। এই অশান্তি আর উদ্বেগ কবিতার প্রাণ ও শরীরে লক্ষানীয় পরিবর্তন এনেছে। গ্রামের নির্লিপ্ত শান্তির নীড় ভেঙ্গে পড়েছে বাইরের প্রতিকূল ঝড়ে। উড়ে যাচ্ছে সযত্নলালিত শান্ত, নিবিড় রূপমুগ্ধতা, আত্মমুখী হৃদয়বৃত্তি। সমকালীন পৃথিবী , আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ঘটনার প্রতিঘাতে কবি যেন আপন হতে বাহির হয়ে অনেকটা বাইরে দাঁড়িয়েছেন, কান পেতে শুনছেন মানুষের পৃথিবীর ভাষ্য।* '' (পৃষ্ঠা-৩১)

এখন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও এই একই কথা সত্য। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে 'সাতটি তারার তিমির' যে অর্থে সীমারেখা, ঠিক একই অর্থে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'উলুখড়ের কবিতা'(প্রকাশ ১৯৫৪) কাব্যগ্রন্থটি একটি সীমারেখা। 'উলুখড়ের কবিতা'-র আগে লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'গ্রহচ্যুত'(১৯৪২খ্রী) , রাণুর জন্য' (প্রকাশ ১৯৫১খ্রীঃ) কাব্যগ্রন্থ দুটি। ১৯৬৪খ্রীঃ প্রকাশিত হলেও 'তিন পাহাড়ের স্বপ্ন' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলি রা ণুর জন্য' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের আগে একটি নির্দিষ্ট সময়ে লেখা। এই কয়টি কাব্যগ্রন্থেই কবি আত্মমগ্ন বেশ পোক্তভাবেই। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার সূচিতে সূচনায় ' তিন পাহাড়ের স্বপ্ন' কাব্যগ্রন্থকে রাখবার কারণ হিসেবে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে যুক্তি দিয়েছেন তা পক্ষান্তরে আমার কথাগুলির যুক্তি হিসেবে কাজ করছেঃ ''প্রেম দিয়েই তো সব মানুষের জীবন শুরু হয়।। কোথাও যদি আমাদের কবিতায় সেই পূর্বরাগের ছোঁয়া লাগে, তাহলে জীবনের অন্য- বিষণ্ণ-অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করার আগেই আমরা না হয় প্রাণ ভরে প্রেমের গান গেয়ে নিই ।'' বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথায় স্পষ্ট যে 'তিন পাহাড়ের স্বপ্নে' তিনি অন্য-বিষণ্ণ অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করেন নি। আর 'গ্রহচ্যুত' ও রাণুর জন্য' — এই দুই কাব্যগ্রন্থের 'তোমার মুখ', 'পিকাসোর জন্য', 'মুখোশ', 'ক্লান্তি ক্লান্তি' ইতাদি কবিতায় লক্ষ্যনীয় মাত্রায় ব্যক্তিমনস্কতার প্রকাশ বলে দিচ্ছে যে কবি তার সূচনায় কতটা আত্মমগ্ন ছিলেন। কিন্তু 'উলুখড়ের কবিতায়' তাঁর আশ্চর্য পরিবর্ত ন। আর তারপরে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় আটত্রিশ খানা কাব্যগ্রন্থে ভয়াবহভাবে সমাজমনস্ক কবি। জীবনানন্দ তাঁর শেষ সময়ে এসে দ্বেষ, রক্ত, আগুন, ক্ষুধা-তাড়নার কথা বলা শুরু করেছিলেন, যে কথাগুলোকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন জীবনানন্দের 'আশ্চর্য কবিতা', তাই আরো লাল, আরও ভয়াবহরূপে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'উলুখড়ের কবিতা' ও তার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে সোচ্চারে প্রকাশিত।

যা হোক , এই দুজন কবির প্রায় সমপ্রতিক্রিয়ায় লেখা কিছু কবিতা কে পাশাপাশি স্থাপন করলে আমার উপরোক্ত বিচারের সত্যতা সহজেই প্রতীয়মান হবে। লক্ষ্য করুন, জীবনানন্দের'সাতটি তারাব তিমিরের অন্তর্গত ' সময়ের কাছে' কবিতার কয়েক ছত্র ঃ

'' আর সে চলার পথে বাধা দিয়ে অন্নের সমাপ্তিহীন ক্ষুধা;/ কেন এই ক্ষুধা—/ কেনই সমাপ্তিহীন!
যারা সব পেয়ে গেছে তাদের উচ্ছিষ্ট,/যারা কিছু পায় নাই তাদের জঞ্জাল/ আমি এই সব।''

'বেলা অবেলা কালবেলার' অন্তর্গত অথবা 'এই সব দিন রাত্রি' কবিতার একটি ছত্র দেখুন ঃ

'' মন্বন্তর শেষ হ'লে পুনরায় নব মন্বন্তর;''

উপনিবেশিক শাসনের আওতায় ক্ষুধা -মন্বন্তর সেই সময়ের গ্লানিকে স্মরণ করায়। ১৯৪৩-৪৪ এর মানুষের তৈরী দুর্ভিক্ষ তাঁর কবিতায় উপস্থিত। আর সেই ক্ষুধা-অনাহার-অপুষ্টি জীবনানন্দের সময় অতিক্রম করে হৈহৈ করে চলল বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সময়ে। ১৯৬৬ সালের খাদ্য-আন্দোলন এখনও আমাদের স্মৃতিতে অমর। এ যন্ত্রণা উত্থাপনে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আরও মারাত্মক — হৃদয়, বিষাদ সব কিছুকেই তুচ্ছ করতে পারেন, যদি অবশ্য অনাহারে এক টুক্‌রো রুটি পান; তাই কবিতা জুড়েই তাঁর , এ-রকম খাই খাই। তাঁর উলুখড়ের কবিতার অন্তর্গত 'রুটি দাও' কবিতার কয়েক ছত্র লক্ষ্য করুন ঃ

''হোক পোড়া বাসি ভেজাল মেশানো রুটি / তবুতো জঠরে বহ্নি নেবানো খাঁটি /
... হৃদয় বিষাদ চেতনা তুচ্ছ গনি/ রুটি পেলে দিই প্রিয়ার চোখের মনি।''

জীবনানন্দের 'যারা সব পেয়ে গেছে তাদের উচ্ছিষ্টের' অনুরণন বুঝি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ' কবিতাটি ঃ

''আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে / কারা যেন আজও ভাত রাঁধে,/ ভাত বাড়ে , ভাত খায়।''

কেউ কেউ ভাত খায়; বাকি যারা উপোসী, তাদের নাকে লোভনীয় ভাতের গন্ধ পৌছায়; খিদে বাড়ে; কিন্তু ভাত নাই।

ক্ষুধার পাশাপাশি উপরের উদ্ধৃত কবিতাগুলি শ্রেণীবৈষম্যেরও ইঙ্গিত দেয়। শ্রেণীবৈষম্যের এই রূপটি জোরালোভাবে ধরা পরে জীবনানন্দের লেখা নিম্নে উদ্ধৃত ছত্রে ঃ

(১) ''পৃথিবীতে সুদ খাটে, সকলের জন্য নয়।'' (কবিতা —১৯৪৬-৪৭)

(২) ''যাদের আস্তানা ঘর তল্পিতল্পা নেই
হাসপাতালের বেড হয়তো তাদের তরে নয়।'' (কবিতা -এই সব দিন রাত্রি)

পাশাপাশি শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের 'কালো বস্তির পাঁচালি' কবিতায় সূর্যের প্রতি কটাক্ষ লক্ষ্যনীয় ঃ

''আয় রোদ্দুর বস্তিতে —
আধমরা ঐ খুকুর ঠোঁটে একটু চুমুর স্বস্তি দে।
আয় লক্ষ্মী আয়রে সোনা!
এইটুকুতেই জাত যাবে না''।

রোদ্দুর বা সূর্যও যেন কোন একটা শ্রেণীর করায়ত্ত; নাহলে, তার জাত যাওয়ার ভয় হবে কেন? সেও ফিডব্যাক ভালো বোঝে; শ্রেণী বৈষম্যের এমনই বিষম ফল।

ঠিক এই ভাবেই যুদ্ধ , লালসা, নৈতিক মানের স্খলন, রুদ্ধ শ্বাস, নরহত্যা ,মৃত্যু , রক্তপাত ইত্যাদি সময়ের গ্লানি কলম এড়ায়নি এই দুই কবির। জীবনানন্দের 'এইসব দিনরাত্রি' কবিতার কয়েক ছত্র তোলা যাক ঃ

''যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল;
মানুষের লালসার শেষ নেই;
উত্তেজনা ছাড়া কোনদিন ঋতু ক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
নেই।''

অথবা ঃ ‘‘এ-আগুন এত রক্ত মধ্যযুগ দেখেছে কখনো?’’

আবার ‘১৯৪৬-৪৭’ - কবিতায় ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার চিত্রটি লক্ষ্য করুন ঃ

‘‘তার রক্তে আমার শরীর/ ভরে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার/ ভাই আমি;’’

এতোসব ক্ষুধা , রক্ত, লালসার, নীতিহীনতার মাঝখানে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর এক ধরনের রক্তপাত দেখলেন, যা জীবনানন্দের মৃত্যুর পরের দুটো দশকের ভুল বোঝাবুঝির রাজনীতি সঞ্জাত। আমি ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে সত্তুরের মাঝামাঝি সময়কালে নব্য সন্ত্রাসবাদী(?) কমিউনিস্ট তরুণ বা নক্সালবাদী তরুণদের উপর নির্বিচারে পুলিশী সন্ত্রাসের ভয়াবহতার কথা বলতে চাইছি। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আমার সন্তান যাক্ প্রত্যহ নরকে’, ‘মুন্ডহীন ধরগুলি আহ্লাদে চিৎকার করে’, ‘স্বদেশ প্রেমের দীপ্ত মহিমায়,’ ‘মানুষ খেকো বাঘেরা বড় লাফায়’ ইত্যাদি আরও বহু কবিতাতেই এরকম সময় ধরা পড়েছে ঃ

(১) ‘‘আমার সন্তান যাক প্রত্যহ নরকে
ছিঁড়ুক সর্বাঙ্গ তার ভা ড়াটে জহ্লাদ;
উপ্‌ড়ে নিক চক্ষু, জিহ্বা দিবা দ্বিপ্রহরে
নিশাচর শ্বাপদেরা’’- (কবিতা— আমার সন্তান যাক প্রত্যহ নরকে)

(২) ‘‘...... সভা ঘিরে ভিতরে বাহিরে যত ইস্তেহার মিছিল/ ভাষণ, তত ভাড়াটে পুলিশ, খুনে দীর্ঘ হয়; স্ফীত হয় তাদের উদর, হস্ত/ নাসিকা, জিহ্বার অগ্রভাগ নরখাদকের আস্ফালনে, ইতর , অশ্লীল ....’’ (কবিতা ‘নরক’ — মুন্ডুহীন ধরগুলি আহ্লাদে চিৎকার করে কাব্যগ্রন্থ)

তাই তাঁর ‘রূপসী বাংলা’ কবিতায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘ রূপসী বাংলার’ কবি জীবনানন্দের বাংলাকে বুকে নিয়ে শান্তিতে ঘুমোবার বাসনাকে সঠিক কটাক্ষ করেছেন ঃ

‘‘ চোখের জল শুধু চোখের জল
চুমার দাগগুলিকে ধুয়ে দেয়;
তুমি মিছেই বুকে টেনেছো , তার মুখ
চোখের জলের সাগর’’।

প্রথম দিকে যাই বলুন না কেন, শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দও তো ‘এই চোখের জলের সাগর’ বাংলাকেই ‘শতাব্দীর অন্তহীন আগুনের ভিতর’ পুড়তে দেখেছিলেন। দেখবার এই স্থানটিতেই তাঁদের মিল।

এতো গেল সময় -সমস্যা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এই দুই কবির সাদৃশ্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কথা। সমস্যা উপস্থাপনের তুলনায়ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের পথের সন্ধান দেওয়া। এই উত্তরণের প্রক্রিয়া নির্ধারনের ক্ষেত্রেও অদ্ভুত মিল রয়েছে এই দুই কবি তথা চিন্তাবিদের মননে। কবি ও চিন্তাবিদ— দুই হিসেবেই এনারা দুজনই মানবতাবাদী। সবকিছুর উর্দ্ধে অন্তিম প্রক্রিয়া হিসেবে দুজনই তাই স্থাপন করেছেন প্রেমকে; এবং তা সব অর্থেই।

জীবনানন্দ তার কাব্য জীবনের প্রথম দিকেই তাঁর ‘বোধ’ কবিতায় হাজার টানাপোড়নের মধ্যেও এই ভালবাসার ইঙ্গিত দিয়েছেন ঃ ‘ তবুও সাধনা ছিল একদিন - এই ভালবাসা’। আর ‘ সুরঞ্জনা’ কবিতাতে এসে এই ভালবাসা আলোর প্রতীক ঃ

‘‘ সেই ইচ্ছা সংঘ নয় , শক্তি নয়, কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়;/
আরো আলো ঃ মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয় ’’।

এই আলো তবে ক্রমমুক্তির পথ ঃ

" এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।" — কবিতা ঃ 'সুচেতনা'।

জীবনানন্দ এই আলোর পথ খুঁজেছেন মানুষের হৃদয়ের পথেই। তাই ' পৃথিবীর ভরাট বাজার ভরা লোকসান/ লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত আমিষ গন্ধ ঠেলে' তিনি ' অন্তিম মূল্য' পেতে চান আমাদের প্রেমে' (কবিতা - পৃথিবীতে এই)।

আবার বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক সময় কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিলেও শেষ পর্যন্ত নিজেকে কমিউনি স্ট বলতে রাজি নন; রাজি হন বা না হন, তিনি কমিউনিস্ট নন এমনটা ও নয়। ভাবনার একটা স্তর পর্যন্ত তিনি মার্কসিয়ান বস্তুবাদী; তাই বিপ্লব - লড়াই - ভাঙবার গান মাঝে মধ্যেই তার কণ্ঠে শ্লোগানের মতো হয়েছে - যেমন ঃ " আসলে ক্রুশ বিদ্ধ হওয়া নয়/ ক্রুশটাকেই ভেঙ্গে ফেলা দরকার।" (কবিতা ঃ নতুন প্রত্যয়) কিন্তু শেষ পর্যন্ত , কমিউনিস্ট হয়েও তিনি কমিউনিজম্‌কে অতিক্রম করেছেন চূড়ান্ত ভাববাদী পথে। এই পথেই উর্দ্ধে তাকিয়ে তিঁনি দেখেন ঃ

"আমরা ভালবাসার আগুন বুকে নিয়ে/ তাকাই উর্দ্ধে, দেখি ঃ কালপুরুষ, সপ্তর্ষীর আলোয়— /
একই ভালবাসার সাত রঙ, আলো আকাশ/ আলোর ভালবাসা" ('রঙমহল')

তাঁর কাছে ভলবাসার চোখের জলেই সব কালো ধুয়ে যায়। তাই চারিদিকের রক্ত স্নানের মাঝখানে আমাদের পারস্পরিক সন্দেহ-অবিশ্বাসের দিনগুলোতে ভালবাসার স্পর্শই অন্যান্য সব কৌশলের তুলনায় ভাল পথ হতে পারতো বলে তাঁর ধারণা ঃ " (বন্ধুর হাত) স্পর্শ করলে পুনর্জন্ম হ'তে পারে; /কিন্তু মাঝখানে;/ বাতাসের শূন্যতা "—(কবিতা — 'বন্ধুর হাত')

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো — ' ফুল ফুটুক আর না ফুটুক তবুও বসন্ত'— এমন কথা তিনি বলেন না; বরং বলেন " প্রেমের ফুল ফুটুক, তবেই বসন্ত"—।

তাই উত্তরণের পথ জীবনানন্দ ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ে একই — এ ভাববাদের পথ — আবার এ কোনো নতুন পথ নয় — আমাদের সবার জানা পুরাতনী অথচ নিত্যকালের পথ। তবে তো বীরেন চট্টোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন প্রবন্ধের প্রথম পাতায় উদ্ধৃত সাক্ষাৎকারে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল যে ভূমিতে জল সিঞ্চন করেছেন, সেই ভূমিতেই জীবনানন্দ জল সিঞ্চন করেছেন; আর বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই ভূমিতেই তাঁর প্রয়োজনীয় জলের উৎস সন্ধান করেছেন। তাই জীবনানন্দ তাঁর 'আলোপৃথিবীতে' যদি উচ্চারণ করেন ঃ " আজ তবু কণ্ঠে বিষ রেখে মানবতার হৃদয় /স্পষ্ট হতে পারে পরস্পরকে ভালোবেসে।" তবে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেমে থাকবেন কেন ! তিনিও বলবেন ঃ

" হোক এক মুহূর্তের , তবু মানুষের / নাম ধরে পরস্পর আলিঙ্গন , / তিলে তিলে সঞ্চিত ঈর্ষার থেকে এই উত্তরণ, প্রেমে/ অমল হওয়ার এই সাধ/ পাশাপাশি দুই অন্ধকার দেশের ভিতর প্রথম আলোর মতো / আমাদের পথ দেখায়। একটিই পথ। ভালোবাসা "। (কবিতা ঃ দুই দেশ)

আর জীবনানন্দের মুখের কথা আওড়ে নিয়ে আমাদের আশ্বাস দেবেন তিনি ঃ " আর আমরা তিমির -বিনাশী মানুষ তোমার (আদিম অন্ধকারের মুখোশ দেবতার যা তিমির-বিলাসী অহঙ্কারে আর দারুণ অপ্রেমে আমাদের ধ্বংস করতে চায়)-ক্রোধকে-অতিক্রম করি / আমাদের প্রেমে "। (একটি অসমাপ্ত কবিতা)

রবীন্দ্র চিত্রকলার টেক্‌নিক্‌ ও বিষয়বস্তু

ডঃ সুবোধ সেন

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা কলাজগতের অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। এ বিশ্বকবির বহুমুখী প্রতিভার একটি দিক মাত্র। চিত্রকলা তাঁর শেষ জীবনের সৃষ্টি। ১৯৩০ সনে তিনি প্রতিমা ঠাকুরকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন-" আমার বয়স সত্তর হয়ে এল। আজ ত্রিশ বছর ধরে যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করচি , আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে যেন ভিত পাকা হবে। ছবি কোনো দিন আঁকিনি, আঁকবো বলে স্বপ্নেও বিশ্বাস করিনি। হঠাৎ বছর দুই তিনের মধ্যে হু হু করে এঁকে ফেললুম, ... জীবনগ্রন্থের সব অধ্যায় যখন শেষ হয়ে এল, তখন অভূতপূর্ব উপায়ে আমার জীবনদেবতা এর পরিশিষ্ট রচনার উপকরণ জুগিয়ে দিলেন!" এ থেকে বলা যায় জীবনের শেষ বয়সের সৃষ্টি বলেই তাঁর চিত্রকলা গভীর ও ব্যাপক ।

রবীন্দ্র-চিত্রকলার টেক্‌নিক্‌ ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করার আগে চিত্রকলা কি এবং এর প্রক্রিয়া কি, সেই সম্পর্কে একটি সাধারণ আলোচনা করা প্রয়োজন।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে "Art is not photography " । প্রকৃতির রাজ্যে যে রং , রেখা ও রূপের ছন্দময় সহজ স্বাভাবিক প্রকাশ তার নির্ভুল প্রতিরূপ আর্ট হতে পারে না, তা হবে ফটোগ্রাফী। আর্ট হল অন্তরের আনন্দ-সাগর যা বাইরে বেরিয়ে গিয়ে অপর মনে অনুরূপ আনন্দের দোলা দেয়। হৃদয়ের নিবিড় ক্ষণে সৃষ্ট ভাবের মূর্ত রূপকে শিল্পকর্ম আখ্যা দেওয়া যায়। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যত শিল্প সৃষ্টি হয়েছে এবং আরো সৃষ্টি হবে তার সকলেরই প্রক্রিয়া অভিন্ন। প্রকৃতিতে সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া, শিল্পেও সেই একই প্রক্রিয়া। ভাব এবং রূপের নিবিড় মিলনে শিল্পকর্মের উৎপত্তি হয়। রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিতা উদ্ধৃত করে বলা যায় ঃ

> রবীন্দ্রনাথের টেক্‌নিক্‌ একদিকে যেমন অভিনব , অপর - দিকে প্রাচিন ট্র্যাডিশনের সঙ্গে তেমনি নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। কুলশীলহীন সয়ম্ভূ নয়। আর চিত্রকলার মর্ম হল , " সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর "।

" ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ ...
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া। "

শিল্পকর্মে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ হয় তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, তা হল বোধের বস্তু। চাঁদের আলোর বর্ণনা বিশ্লেষণ করে জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য উপলব্ধি হয় না। সৌন্দর্য কোনো সংবাদ দেয় না, এ কেবল মুগ্ধ করে। তাই একটা কথা প্রচলিত রয়েছে,""Great art is an unconscious creation"। উঁচুদরের কলা সৃষ্টিকে বলা যায় অপ্রবুদ্ধ সৃষ্টি, অর্থাৎ স্রষ্টার অজ্ঞাতসারেই তাঁর সৃষ্টিতে অনন্য সাধারণ মনোহারিত্ব প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় এই গুণের সামান্যতম অভাব নেই।

রবীন্দ্রনাথ রেখা দিয়ে খেলতে খেলতে কখন যে চারুকলার রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছেন তা প্রথমটায় তিনি নিজেও জানতে পারেন নি। তিনি নিজের খাতায় কবিতা লিখতেন এবং সংশোধনের সময় নানা কাটা- কুটি করে সংশোধন করতেন। কিন্তু কবিতার খাতায় এই কাটকুট গুলো তাঁর চোখে নিতান্তই কুৎসিৎ ঠেকত। তাঁর কলারসিক মনের পক্ষে এইসব কুৎসিৎ দৃশ্য অসহনীয় হয়ে উঠেছিল বলেই তিনি কাটকুটের উপর কলম চালিয়ে তাকে সুন্দর করে তুলবার চেষ্টা করেছেন ; এর ফলে নানা হিজিবিজি নক্সা সুন্দর হয়ে ফুটে উঠল। এভাবে এলোমেলো কাটকুটে রূপান্তর সাধন করে যা গড়ে তুললেন তাই কলার রূপ পেল। তিনি এ কাজ অত্যন্ত আনন্দের সাথে করতেন। এই রেখা নিয়ে খেলা করে করে একদিন তিনি

চারুকলার রাজ্যে পৌঁছে গেলেন। সৃষ্টির প্রেরণায় মনের আনন্দেই তিনি ছবি এঁকেছেন। সেই ছবি আঁকার সময় একবারও ভাবেননি যে তা ভালো হল কি খারাপ হল। ভাল-খারাপ চিন্তা করে মহৎ সৃষ্টি হয় না। যা সৃষ্টি হয় তা "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি"। তার সামান্য পরিবর্তণ হলেই কলার ধ্বংস হবে। মহৎ সৃষ্টির অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য স্রষ্টার অজ্ঞাতে তাঁর সৃষ্টিতে সঞ্চারিত হয়।

সমগ্র জীবনব্যাপী কবিতা লেখার ফলে রবীন্দ্রনাথের মনের ভান্ডার অসংখ্য চিত্রের সমাবেশে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কেবল লেখার প্রবাহে কথার ফুল ফুটিয়ে সেই ভান্ডার নিঃশেষ করে দেয়া যায় না। তাই তিনি কথার কাটাকাটির উপর কলম চালিয়ে যখন রেখা আঁকায় পাকা হলেন তখনই তাঁর কলমের মুখে বা তুলির মুখে মনের পরিপূর্ণ ভান্ডারের চিত্র -সৃষ্টির ঝর্ণাধারা বেরিয়ে এল।

বিখ্যাত চীনা চিত্রকর মি. ফেই সম্বন্ধে লিন্ ইউ তাং যা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তা বলা চলে : " Mi Fei , one of the greatest of scholar- painters, sometimes used even a roll of paper for his brush or the pulp of suger-cane,or the stalk of a lotus flower when the inspiration came and there was magic in the scholar's 'wrist', there was nothing which seemed impossible to these artists. For they had mastered the art of conveying fundamental rhythms, and every - thing else was secondary... . Painting was and still is the scholar's recreation."

এ থেকে বোঝা যায় চীনা চিত্রকর মি. ফেই - র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য মিল রয়েছে। তাঁরই মত রবীন্দ্রনাথ কবি ও চিত্রকর। কবির আঁকা চিত্রে নেই কেবল চিরাচরিত পদ্ধতি, কেবল আছে ছন্দময় রূপের মধ্য দিয়ে ভাবের প্রকাশ। তাঁর চিত্রকলার মূল টেকনিক হল আভাসে - ইঙ্গিতে রূপের প্রকাশ এবং তা বৈচিত্রময়। তিনি কোন বিদেশী রীতিঅনুসরণ করেননি, তাঁর চিত্রের বিষয় বস্তু থেকে আলাদা করে টেক্‌নিক সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ যা দেখতেন তার মধ্যে একটা নতুন কিছু দেখাকে তিনি 'ছবির দেখা' বলতেন। এই 'ছবির দেখা'কেই তিনি রঙে রেখায় অপরকে দেখালেন ছবি এঁকে। এই 'ছবির দেখা' সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন : "In fact, forms in the external sense are without beauty and without ugliness...Truely speaking, there is nowhere such a thing as beauty and ugliness except in our mind."(৪) (প্রকৃতপক্ষে বস্তুর যে নিজস্ব রূপ, তা সুন্দর নয়, কুৎসিতও নয়।.... সত্যি বলতে, আমাদের মন ছাড়া আর কোথাও সুন্দর বলে কিছু নেই।) " ছবির গোড়ার কথা হচ্ছে রূপভেদ। একটা গাছকে দেখছি— দেখি তার ভেতরে human quality (মানুষী ভাব) । রবিকা গান গেয়েছেন— 'তুমি কে লো? আমি বকুল' — যেন কিশোরী মেয়েটি ঝরে যাবে দুদিন বাদে। ' তুমি কে লো ? আমি পারুল।' হাসি - খুশিতে ভরা, আর সাজসজ্জার বাহারে উজ্জ্বল, তার যেন বিশেষ একটা গর্ব আছে। 'আমি শিমূল' — একটু লজ্জিত, একটু কুণ্ঠিত,— যেন সুকুমারী। তিনি তো শুধু ফুল দেখেননি, দেখেছেন তার ভেতরে এই সব human quality- র রূপ। এই যে রূপভেদ — আমরা দু ই-ই দেখি। মানুষের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা , তাই এসে যায় মানুষই। রূপ is form, চোখে দেখি, মনেও দেখি। দুটো রূপ। মানুষের মনে যা দেখি, তা মানুষিক ভাব; আর চোখে দেখি প্রকৃতির ভাব। দুই থাকা চাই। মনের দেখাও চাই, চোখের দেখাও চাই।" (৫) এই ছবি দেখাকে রবীন্দ্রনাথ রঙে রেখায় এঁকে এঁকে প্রায় আড়াই হাজার ছবির সাহায্যে অপরকে দেখালেন। তাঁর ছবি আঁকার টেক্‌নিকের প্রথম কথা হল, তিনি গাছের শাখা প্রশাখায়, পাতায় পাতায় জীবজন্তুর যে মূর্তি দেখতে পেলেন, তা সেখানে নেই অথবা সেই ছবি সেখানে বাস্তবে আছে

এমনটাও নয়— কেবল মনে সৃষ্ট রূপের একটি অস্পষ্ট আভাস প্রকাশ হয়েছে বলে ভাবা যায়। তাঁর মানস নেত্রে প্রকৃতির যে রূপ দেখা গেল তা কেবল চিত্রে ফুটে উঠল। তাও নকল করে নয়। কারণ, প্রকৃতির অনুকরণ আর্ট নয়। কবি প্রকৃতি থেকে রূপ ও ভাব প্রকাশের কৌশল সম্পর্কে প্রকৃতির কাছ থেকেই পাঠ নিয়ে ছবি আঁকা আরম্ভ করেছিলেন। প্রকৃতিকে নকল করেননি। তাই তাঁর সৃষ্টি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে রচিত হয়েছিল। তাঁর 'খাপছাড়া' বইয়ের ছবিগুলো দেখলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অসংখ্য রেখায় নিখুঁত শিল্প সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এখানেও বাস্তবের অনুকরণে ছবি আঁকেননি বা আঁকার চেষ্টা করেন নি। তাঁর আঁকা সবগুলো ছবি দেখলেই বোঝা যায় যে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি ছবি আঁকেন নি। তিনি ছবি আঁকার সময় হয়তোবা তুলি, কলম এবং এর সঙ্গে কলমের উপরের অংশ, পালকের কলম ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। রেখা দিয়ে এবং আলো ছায়ার অপূর্ব সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছিল এক অভূতপূর্ব শিল্পকর্ম যা বিশ্বের শিল্পকলাকে প্রচলিত সুনির্দিষ্ট টেক্‌নিকের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছিল। বহুবছর ধরে পাশ্চাত্য জগতের আর্ট আন্দোলনের মুক্তি সহজেই ঘটেছিল রবীন্দ্র - চিত্রকলায়।

টেক্‌নিক্ আর্টিস্টের বস্তু, দার্শনিকের ভাবার বিষয় নয়। তবুও প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী টেক্‌নিককে স্বতন্ত্র করে দেখলে, রবীন্দ্রনাথের টেক্‌নিক্ একদিকে যেমন অভিনব, অপরদিকে প্রাচীন ট্র্যাডিশনের সঙ্গে তেমনি নিবিড় ভাবে সংযুক্ত। কুলশীলহীন সয়ম্ভু নয়। তাঁর চিত্রের আরো একটি বড় জিনিস হল, তাঁর রুচি। এই রুচি অতি সূক্ষ্ম, অতি পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর।

রবীন্দ্র - চিত্রকলার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য হল যে তাঁর চিত্রে রূপাতীত সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস। বিচিত্র ভঙ্গীর ছন্দোময় রেখা ও বহু অপূর্ব বর্ণবিন্যাস যে রবীন্দ্র - চিত্রকলায় কত আছে তার অন্ত নেই। বর্ণ ও রেখার মাধ্যমে মানব মনের অতি সূক্ষ্ম উৎকণ্ঠা ও সূক্ষ্মতর ইন্দ্রিয়ানুভূতির ইন্দ্রজাল অপূর্ব কৌশলে রূপায়ীত হয়েছে। রবীন্দ্র - সৃষ্টিতে রূপ মুখ্যতঃ ভাবাত্মক— রেখা ও বর্ণ রূপকে বরণ করেও অরূপের আরাধনা করে। তাঁর চিত্রকলার মর্ম হল " সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।" রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেছেন ঃ "People often ask me about the meaning of my picture ; I remain silent, even as my pictures are. It is for them to express and not to explain,"

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় যে ভাবের প্রকাশ তা রূপের মধ্যে অরূপের প্রকাশ। এই অরূপের মধ্যেই রয়েছে অসীমের আত্মপ্রকাশ। আর্টের বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের কবিতাতেই মূর্ত হয়েছে ঃ

" পরম সুন্দর
আলোকের স্নান পূণ্য প্রাতে।
অসীম অরূপ
রূপে রূপে স্পর্শমণি
রসমূর্তি করিছে রচনা,
প্রতিদিন
চির নূতনের অভিষেক
চির পুরাতন বেদীতলে
* * * * * * * * *
সবকিছু সাথে মিশে' মানুষের প্রীতির পরশ

অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চির মানবের সিংহাসন।''

(আরোগ্য । ২ সংখ্যক)

''রূপের ঠাট এক বাইরের মতো, আর এক মনের মতো, ফটো দেয় বাইরের ঠাট, রূপদক্ষ দে মনোমতো রূপের ঠাট সমস্ত''(৭) এবং তখনই সেরূপ রস - মূর্তি হয়ে ওঠে — আর্টিস্টের প্রীতির পর অমনি তা অমৃতের অর্থ লাভ করে— আর্টের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে রবীন্দ্র-চিত্রকলাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) প্রাকৃতিক দৃশ্য ও গাছ-পালা লতা-পাতার চিত্র,(২) মানুষের প্রতিকৃতি এবং (৩) জীবজন্তুর ছবি।

(১) রবীন্দ্রনাথ গাছ-পালা লতা-পাতা, ফুল ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র অনেকগুলি এঁকেছেন যার মূল্য প্রধানত আলঙ্কারিক। প্রকৃতির নিখুঁত অনুকরণের চেষ্টা নেই ; শুধু একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপের সৃষ্টি কিংবা বিভিন্ন সমাবেশে আলোছায়ার খেলা।

(২) রবীন্দ্রনাথের আঁকা মানুষের চিত্রগুলো কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় ঃ বাস্তব চিত্র, ভীষণ মূর্তি , পোর্ট্রেট্ বা মানুষের প্রতিকৃতি, মুখোশ, নিজের প্রতিকৃতি, নাটকীয় মূর্তি।

(৩) জীবজন্তুর ছবিগুলোতে হুবহু কোনো জীবের চিত্র না এঁকে রূপের আভাসমাত্র তাতে ফুটি তুলেছেন। জীব-জন্তুর ছবিগুলোর মধ্যে বাস্তব, আলঙ্কারিক ও অদ্ভুত এই তিন রকমের চিত্র দেখা যায়

রবীন্দ্র-চিত্রকলায় শ্রেষ্ঠ চিত্রের সকল গুণ পরিলক্ষিত হয়। রুচি,রং,ভাব সকল বিষয়েই তিনি জ্যোতিষ্মান। তাঁর চিত্রকলা তাঁর জীবনের 'ফ্যাশণ' নয়, 'হবি'- ও নয়, তা হলো তাঁর জীবনমন্থন - করা অমৃত। তার ছবি দেখে রসজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন ঃ ''এমনটি আর হয় না — অতুলনীয়, অনন্যসাধারণ

তথ্যসূত্র ঃ (১) Viswa Bharati Quarterly, May-Oct.1942.
(২) বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।
(৩) My country and My people _ Lin Yu -tang
(৪) ষড়ঙ্গ — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(৫) আর্ট প্রসঙ্গ — ঐ
(৬) আরোগ্য — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(৭) বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(৮) রবীন্দ্র চিত্রকলা — মনোরঞ্জন গুপ্ত।
(৯) পত্রাবলী — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Bengali literary (Yearly)
1st Year : 1st Issue
9th May,2002

Edited By
Nripendra Narayan Bhattacharya,
Published from
Shibjagna Road, Khagrabari,
Cooch Behar - 736101 ; Ph. No - 22135
Cover Design and illustration by
Anirudha Palit.